অতীত ও ঐতিহ্য

অষ্টম শ্রেণি

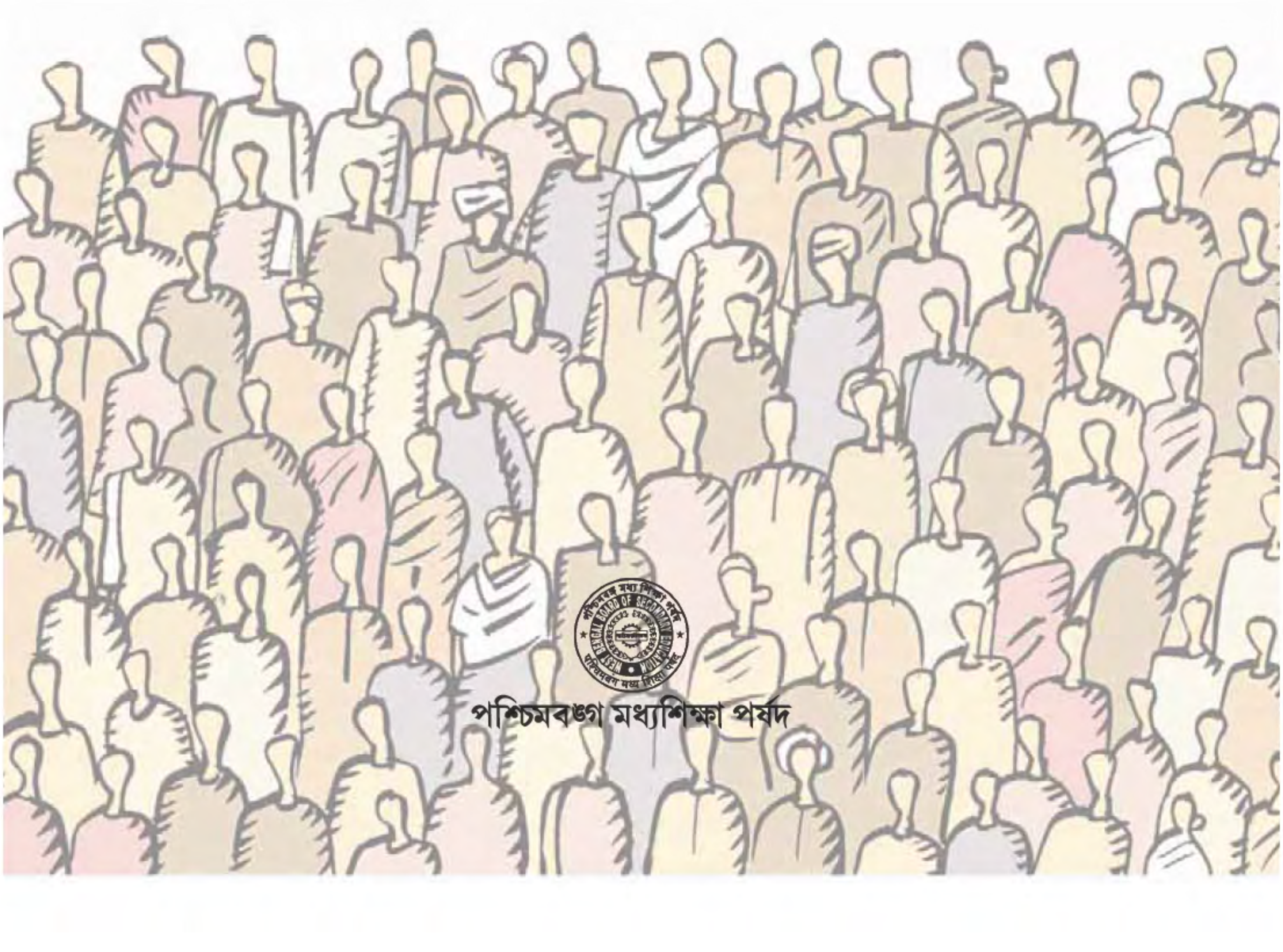

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

নবনীতা চ্যাটার্জী
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক *অতীত ও ঐতিহ্য* প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বইটিতে ধাপে ধাপে ভারতের আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা হাতেকলমে কাজের পরিসর রাখা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

অতীত ও ঐতিহ্য বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

জুন, ২০১৪
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম *অতীত ও ঐতিহ্য*। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। অষ্টম শ্রেণিতে ভারতের আধুনিক সময়ের ইতিহাস-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজভাবে ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অতীত, জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্য আন্দোলনসমূহের বিচিত্র ও জটিল গতিপথগুলি যথাযথ মূর্ত অবয়বে শিক্ষার্থীর সামনে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টাও আমরা করেছি। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তক যাতে কার্যকর হয়, সেবিষয়ে, বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী– 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জুন, ২০১৪
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য—

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য–সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান—

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা–সহায়তা—

অনির্বাণ মণ্ডল

কৌশিক সাহা

গৌতম বিশ্বাস

প্রদীপ কুমার বসাক

প্রবাল বাগচি

সত্যসৌরভ জানা

সহিদুর রহমান

সুগত মিত্র

গ্রন্থসজ্জা—

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র : দেবব্রত ঘোষ

মানচিত্র নির্মাণ : হিরণ্ময় ঘোষ

মুদ্রণ সহায়তা : অনুপম দত্ত , বিপ্লব মণ্ডল ও ধীমান বসু

বিশেষ সহায়তা—

তিস্তা দাস পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ দেবাশিস রায়

****

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ইতিহাসের ধারণা	১
২. আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	১৩
৩. ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৩৫
৪. ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র	৫৩
৫. ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া : সহযোগিতা ও বিদ্রোহ	৭৭
৬. জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ	৯৭
৭. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন	১১৫
৮. সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ	১৩৫
৯. ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার	১৪৭
○ ভারত-ইতিহাসের সালতামামি	
○ শিখন পরামর্শ	

১ ইতিহাসের ধারণা

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে এই যুগটা বিজ্ঞানের যুগ। অর্থাৎ রোজকার জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দরকার হয়। এমনকী কথাবার্তার মধ্যেও নানা বৈজ্ঞানিকতার ছোঁয়া থাকে। তাহলে বিজ্ঞানের যুগে আজও স্কুলে ইতিহাস বই পড়ানোর দরকারটা কী? এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই তোমাদের কারো কারো মনে আসে। সত্যি যে ইতিহাস পড়ে কী লাভ হয়, তা বোঝা মুশকিল। কেবল পুরোনো দিনে কবে, কে, কী করেছে তার খতিয়ান। তার উপরে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে অনেক আগেই। ফলে ঘটনার ফলাফলগুলোও জানা। অথচ সেই নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক। নানারকম মতামত। যদি ঘটনাগুলো ও সেসবের ফলাফল জানাই থাকে, তাহলে কীসের এত তর্ক? একটু খতিয়ে দেখা যাক তবে।

ইতিহাস বলতে খালি রাজা-সম্রাট-যুদ্ধ-রাজস্বনীতির কথা পড়তে কেবল তোমাদেরই একঘেয়ে লাগে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একঘেয়ে লাগত। দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের এবিষয়ে বক্তব্য কী?

ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথের চোখে

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-একদল উঠিয়া পড়ে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।
.... ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।
.... সেইজন্য বিদেশির ইতিহাসে এই ধূলির ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না।....

....

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদগার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।...."

গঙ্গা নদী-সংলগ্ন চাঁদপাল ঘাট থেকে এসপ্লানেড চত্বরের দৃশ্য। মূল রঙিন ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ফাররুখশিয়রের স্বর্ণমুদ্রা

ভালো করে পড়লে দেখতে পাবে ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সমস্যা নেই। বরং সেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রশ্ন করছেন? সেইসব প্রশ্নের মধ্যে যেটা বড়ো হয়ে উঠছে, তা হলো ভারতের ইতিহাস কে বা কারা লিখবে? বিদেশি ঐতিহাসিক? নাকি ভারতীয়দের নিজেদেরই লিখতে হবে তাদের ইতিহাস?

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বছর আগে একইরকম প্রশ্ন তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও বক্তব্য ছিল বাঙালির ইতিহাস চাই। অর্থাৎ বাঙালি জাতির অতীতের কথা বাঙালিকে জানতে হবে। না জানলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু কেন রক্ষা নেই? কীজন্য ইতিহাস জানা নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা?

আজ যা দেখা যাচ্ছে, যা ঘটছে, এককথায় এই আজ অর্থাৎ বর্তমানটা এসেছে ইতিহাস থেকে। অর্থাৎ বর্তমান কেমন হবে, তা ঠিক হয়ে যায় অতীত থেকেই। বর্তমানের নানা কাজের যুক্তি খুঁজে বার করা হয় অতীত থেকে। সেই নেকড়ে ও ছাগলছানার গল্পটা মনে আছে। ছাগলছানা গেছে জল খেতে। নেকড়ে তাকে ধরেছে। ছাগলছানা যত জানতে চায় তার কী দোষ। নেকড়ে তাকে শোনায় তার পূর্বপুরুষ কী কী অপরাধ করেছিল। নেকড়ের যুক্তি ছিল, ছাগলছানাকে তার পূর্বপুরুষের করা অপরাধের শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ, ছাগলছানার প্রতি নেকড়ের বর্তমান আচরণের যুক্তি লুকিয়ে আছে ইতিহাসে।

হায়দর আলির স্বর্ণমুদ্রা

এবারে নেকড়ের জায়গায় বসানো যাক ভারতে ব্যবসা করতে আসা কোনো নীলকর সাহেবকে। আর ছাগলছানার জায়গায় বসানো যাক গরিব নীলচাষিকে। প্রায় সবসময়ই দেখা যেত নীলকর সাহেবের কাছে চাষির টাকা ধার আছে। সেই ধার বংশগত ধারে পরিণত হতো। ফলে চাষিকেও নীলচাষ করে যেতে হতো। যুক্তিটা একই। তোমার পূর্বপুরুষের করা কাজের ফল তোমায় ভোগ করতে হবে। তাহলে ফল যখন ভোগ করতেই হবে, তখন পূর্বপুরুষের করা কাজের খতিয়ানও জানা দরকার। তাই ইতিহাস পড়তে হবে।

সাদাৎ খানের স্বর্ণমুদ্রা

আর একটা ঘটনা ঘটতে পারে। ধরা যাক নেকড়ে একজন যুক্তিবাদী। তাহলে ছাগলছানা যদি তার ইতিহাস ঘেঁটে দেখাতে পারে যে নেকড়ের যুক্তি ঠিক নয়, তাহলে নেকড়ে হয়তো তাকে ছেড়েও দিতে পারে। অর্থাৎ, ইতিহাস ঘেঁটে আবার দোষ কাটানোও যায়। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। তার মানে ইতিহাস থেকে যুক্তি নিয়ে নেকড়ে যেমন ছাগলছানার উপর অত্যাচার করতে পারে। তেমনি, ছাগলছানাও ইতিহাস ঘেঁটে প্রমাণ করতে পারে যে সে নির্দোষ। বা সে আদপেই ঐ বংশের ছাগল নয়। নেকড়ের ভুল হয়েছে।

আবার একবার নেকড়ের জায়গায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসককে বসানো যাক। আর ছাগলছানার জায়গায় সাধারণ ভারতীয় জনগণ ধরা যাক। ব্রিটিশশাসক ভারতে উপনিবেশ তৈরি করার যুক্তি দিল, ভারতবাসী তো অসভ্য। তাদের দেশে শিক্ষার অভাব, বিজ্ঞানের অভাব, ইত্যাদি প্রভৃতি। আর ব্রিটিশরা সভ্য। তাই প্রতিটি সভ্য

ব্রিটিশের কর্তব্য 'অসভ্য' ভারতীয়দের 'সভ্য' করা। তার জন্য ভারতে ব্রিটিশ-শাসন কায়েম করা দরকার। এই যুক্তির নিরিখে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তৈরি হলো।

কোম্পানি-প্রবর্তিত মুদ্রা

কিন্তু,ভারতীয়রা এই যুক্তি মেনে নিল না। তারাও পালটা বলল, কে বলেছে আমরা অসভ্য? তারপর একে একে সম্রাট অশোক থেকে সম্রাট আকবরের কথা এল। আর্যভট্ট থেকে চৈতন্যদেবের কথা এল। আর সেসবের ফলে প্রমাণ করা হলো যে, ভারতেরও 'সভ্যতা' ছিল। সেই সভ্যতা ব্রিটিশ সভ্যতার থেকে খাটো নয়। তাই ব্রিটিশদের ভারতে সাম্রাজ্য বাড়ানোর দরকার নেই। এই যে ভারতীয়রা পালটা যুক্তি দিল, তা কিন্তু ইতিহাস থেকেই। তারা ভেবেছিল, ব্রিটিশরা যেহেতু ইতিহাস ঘেঁটে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুক্তি দিচ্ছে, তেমনি পালটা যুক্তিও তারা বুঝবে।

অর্থাৎ, ইতিহাস শুধু রাজা-সম্রাটদের নাম, সাল-তারিখ বা যুদ্ধের বর্ণনা নয়। ইতিহাসের মধ্যে মিশে আছে নানান যুক্তি-তর্কের খতিয়ান। ইতিহাসের সাক্ষ্য হাজির করে নিজের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক করা যায়। তার জন্য দরকার ইতিহাস জানা। তাহলে, কেন এখনও স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হয় তার আন্দাজ পাওয়া গেল?

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নাম খোদাই করা ফরাসি মুদ্রা

এবারে আসা যাক, দ্বিতীয় প্রশ্নে। ঘটনা আর তার ফলাফল যখন জানাই আছে, তখন কেন ইতিহাসে এত তর্ক-বিতর্ক? আবারও রবীন্দ্রনাথের লেখাটা ফিরে পড়া যাক। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন স্পষ্ট করে যে, সব দেশের ইতিহাস এক নয়। তাই সাহেব ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, ভারতের ইতিহাস আর ইংল্যন্ডের ইতিহাস আলাদা। অর্থাৎ, দ্বিতীয় জরুরি প্রশ্নটা হলো ইতিহাস কে লিখছে বা কে খুঁজছে?

আবারও বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় ফেরা যাক। বাঙালির ইতিহাস চাই বলেই তিনি থেমে থাকেন নি। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন বিদেশিদের লেখা বাঙালির ইতিহাস ভুলে ভরা। তাই বাঙালির ইতিহাস লিখতে হবে বাঙালিকেই। আর সেই বাঙালি কে? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আমি, তুমি, যে পারবে সবাই। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কেন একই ঘটনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়? কোনো ঘটনাকে দেখার ভঙ্গি বদলে গেলেই, ঘটনার ও তার ফলাফল নিয়ে নানা মতামত তৈরি হয়। সেই যে একরকম ছবি হয়, যাকে নানা কোণ থেকে দেখলে নানারকম ছবি দেখা যায়। আসলে একটাই ছবি। কিন্তু, তার মধ্যে রয়েছে আরো নানা ছবির উপাদান। ঠিক তেমনই মূল ঘটনা ও তার ফলাফল জানা। তবুও, কেন ঐ ঘটনা ঘটল, তার ফলাফল কী হলো — তা নিয়ে বিতর্ক।

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নাম খোদাই করা মুদ্রা। বাংলা প্রেসিডেন্সির থেকে প্রচলিত।

অতএব, প্রথম প্রশ্নদুটোর উত্তর পাওয়া গেল। শুধু বাকি একটাই কথা। এই যে বঙ্কিম বলেছেন, আমি, তুমি সবাই মিলে আমাদের ইতিহাস লিখব — এই কথাটা শুনতে বেশ ভালো। তবে যে সমাজে একটা বড়ো অংশ লোক লেখাপড়ার আওতায়

আধুনিক যুগের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও মুদ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পড়েন না, তাঁরা কীভাবে তাঁদের ইতিহাস লিখবেন? তাহলে কী সবার হয়ে ইতিহাসটা শেষ পর্যন্ত আমিই লিখব? যদি লেখাপড়া জানার নিরিখে বলতে হয়, তাহলে সেই কাজটা সবার হয়ে আমাকেই করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তাহলে, আমি যেভাবে সবাইকে দেখছি সেটাই লেখা হবে। অর্থাৎ, আমার বিচার অনুযায়ী লেখা ইতিহাস হয়ে উঠবে 'আমাদের ইতিহাস'। ঠিক সেই কারণেই ভারতের ইতিহাসও আসলে কিছু শিক্ষিত মানুষের বিচার অনুযায়ী লেখা ইতিহাস। তাই সেখানে সিধু-কানহু ছাড়া সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগ দেওয়া মানুষদের নাম বিশেষ জানা যায় না। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে আন্দোলন করা অসংখ্য মানুষের নাম জানা যায় না। খালি বলা হয় হাজার হাজার সাঁওতাল বা হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ, নাম নয়, শুধু সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় সেই মানুষগুলোকে। কেন এমন হয়? কারণ, যিনি বা যাঁরা সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের চোখে কেবল সিধু-কানহুর নামই যথেষ্ট। মহাত্মা গান্ধি বা সুভাষচন্দ্র বসুই জরুরি। তাঁদের কথা জানলেই হয়ে যায় ইতিহাস জানা। বাকি যারা, তারা তো কেবল হাজার হাজার মানুষ। তাদের আলাদা করে নাম জানার দরকার নেই। আছে কী?

তাহলে, শুধু নিজেদের ইতিহাস নিজেরা লিখলেই যে সব সমস্যা মিটে যাবে, তা কিন্তু নয়। সবসময়ই যিনি বা যাঁরা লিখছেন, তিনি বা তাঁরা যেভাবে কোনো ঘটনা দেখছেন বা বুঝছেন সেভাবেই লিখছেন ইতিহাস। আর ব্যক্তি বদলে গেলে যেহেতু দেখার চোখ ও মন বদলে যায়, তাই একই ঘটনা ও তার ফলাফল নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক। এই তর্ক-বিতর্ক হয় বলেই ইতিহাস পড়াটা মজার। নয়তো তা খালি কতগুলো ঘটনা আর তার ফলাফলের খতিয়ান হয়ে থাকত। তা হয় না বলেই ইতিহাসের মধ্যে টান থাকে। ইতিহাস নিয়ে টানাটানিও চলে সেই জন্যে। নিজের বা নিজেদের যুক্তি যে ঠিক, তা প্রমাণের জন্য ইতিহাস ধরে দড়ি টানাটানির লড়াই চলতেই থাকে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, মালওয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে চিনে আফিম রফতানি করত। সেই আফিম রফতানি নিয়ে চিনের সঙ্গে ব্রিটেনের সংঘাত ও শেষে যুদ্ধ হয়েছিল। এই ছবিটি চিনের ক্যান্টন প্রদেশে ইওরোপীয় ফ্যাক্টরির ছবি। মূল রঙিন ছবিটি উইলিয়ম দানিয়েল-এর আঁকা (১৮০৫-'১০ খ্রিস্টাব্দ)। এই ধরনের ছবিগুলিও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ইতিহাসে যুগ বিভাগের সমস্যা

এই যে ইতিহাস বইটা তোমার হাতে আছে, এটা দেখে অনেকে বলবেন, এটা আধুনিক ভারতের ইতিহাস। কেন? কারণ এতে পলাশির যুদ্ধ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা আছে। ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের শুরু ও শেষ হওয়ার কথা আছে। এসব বিষয় তো আধুনিক ভারতের ইতিহাস। তার আগে ছিল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস। আরও আগে প্রাচীন যুগের কথা। অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে তিনটে ভাগ পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

'আধুনিক' শব্দটা এসেছে অধুনা থেকে । এর মানে বর্তমানকাল, সম্প্রতি বা নতুন। আর সম্প্রতি কিংবা বর্তমানে ঘটেছে যে ঘটনা তাই আধুনিককালের ঘটনা। সেভাবে দেখলে সত্যিইতো কলিঙ্গ যুদ্ধ এই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় অনেক আগে ঘটেছে। তার অনেক পরে ঘটেছে পানিপতের প্রথম যুদ্ধ। তারও অনেক পরে ঘটেছে পলাশির যুদ্ধ। তাই সময়ের হিসাবে পলাশির যুদ্ধ তুলনায় কম অতীত। তাই সেটা খানিকটা 'আধুনিক'। আর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই আরো 'আধুনিক' হয়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাস।

কিন্তু এভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক — এই তিনভাগে ভারতের ইতিহাসকে ভাগ করা শুরু হলো কবে? ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার *রাজাবলি* নামে একটি ইতিহাস বই লিখেছিলেন। ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সময় গোনা শুরু করেছিলেন মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের কাল থেকে। শেষ পর্যন্ত *রাজাবলি* কলিযুগের সময়ে এসে শেষ হয়। আজ কেউ ইতিহাস লিখতে গিয়ে 'কলিযুগের ইতিহাস' শব্দ ব্যবহার করবেন না। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাই করেছেন। তাছাড়া *রাজাবলি*তে প্রায় সব ঘটনার পিছনেই নানা অদ্ভুত সব যুক্তি রয়েছে। রাজাদের কথা বলার জন্যই *রাজাবলি* লেখা। কিন্তু সেইসব রাজাদের কাজগুলোকে যেন চালায় কোনো অদৃশ্য শক্তি। রাজারা কেবল তাদের কৃতকাজের ফল ভোগ করেন।

আজ যেসব ইতিহাস বই লেখা হয়, তাতে অবশ্য এধরনের কথা বলা হয় না বরং বিভিন্ন ঘটনার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা যুক্তি হাজির করা হয়। তাহলে *রাজাবলি*-র ইতিহাস লেখার ছকটা কীভাবে বদলাল?

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে *History of British India* নামে ভারতের ইতিহাস লেখেন জেমস মিল। বইটা লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অতীতকথাকে এক জায়গায় জড়ো করা। যাতে সেটা পড়ে ভারতবর্ষ বিষয়ে সাধারণ ধারণা পেতে পারে ব্রিটিশ প্রশাসনে যুক্ত বিদেশিরা। কারণ, যে দেশ ও দেশের মানুষকে শাসন করতে হবে, সেই দেশের ইতিহাসটাও জানতে হবে। অর্থাৎ, ভারতবাসীর প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের আচরণের যুক্তি নাকি লুকিয়ে আছে ইতিহাসে। সেই আগের নেকড়ে ও ছাগলছানার গল্পটার মতো।

তাঁর ঐ বইতে মিল ভারতের ইতিহাসকে তিনটে ভাগে ভাগ করলেন। সেগুলো হলো— হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। প্রথম দুটো কালপর্যায় শাসকের ধর্মের নামে। আর শেষটা শাসকের জাতির নামে। তাই শেষটা খ্রিস্টান যুগ হলো না, হলো ব্রিটিশ যুগ। অর্থাৎ ধর্ম নয়, জাতির পরিচয়েই ব্রিটিশ সভ্যতা পরিচিত হতে চায়। আধুনিক হতে হলে ধর্মের বদলে জাতির পরিচয়ের দরকার। তার সঙ্গে মিল লিখলেন যে, মুসলিম যুগ ভারত-ইতিহাসে 'অন্ধকারময়' যুগ। পাশাপাশি হিন্দু যুগ বিষয়েও মিল অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন।

মিলের লেখা ইতিহাস থেকে দুটো বিষয় তৈরি হলো। প্রথমত, ভারত ইতিহাসের যুগ ভাগ করা শুরু হলো শাসকের ধর্মের পরিচয়ে। আর মিল ধরে নিলেন প্রাচীন ভারতের সব শাসকই হিন্দু। তাই জৈন ধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিম্বিসারের ইতিহাসও ঢুকে পড়ল হিন্দু যুগের ইতিহাসে। একইভাবে মধ্যযুগের সব শাসককেই মিল মুসলমান ধর্মের সঙ্গে একাকার করে দিলেন। ফলে মুঘল সম্রাট আকবরের মতো উদার শাসকও নিছক ধর্মের পরিচয়ে আটকা পড়লেন। দ্বিতীয়ত, ভারতের ইতিহাসকে মিল তিনটে ধাপের ছকে বেঁধে দিলেন। হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ। ধীরে ধীরে সেই তিনটে ধাপ নাম বদলে হয়ে গেল প্রাচীন, মধ্য

ও আধুনিক। বছর বছর এই ধাঁচেই চলল ভারতের ইতিহাস চর্চা। সেজন্য পলাশির যুদ্ধ বা মহাত্মা গান্ধির আন্দোলন— সব কিছুকেই আধুনিক ভারতের ইতিহাসের খোপে ফেলে দেওয়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, এভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক-এর ছাঁচে ফেলে ইতিহাস দেখাটা সমস্যার। রবীন্দ্রনাথের কথাটা আবার দেখা যাক। সব দেশের ইতিহাস যে একই রকম হতে হবে তার মানে নেই। ঔরঙ্গজেব মারা গেলেন ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সময়কালকে সাধারণত ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে ফেলা হয়। তার মাত্র অর্ধশতক পরে পলাশির যুদ্ধ হয় (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। পলাশির যুদ্ধকে ফেলা হয় ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্বে। অথচ বাংলার নবাবি শাসনের আদবকায়দাগুলো মুঘল প্রশাসন থেকেই নেওয়া হয়েছিল। এমনকী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও তাদের শাসনকালের প্রথমদিকে মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিল। তাহলে কোন যুক্তিতে ঔরঙ্গজেব মধ্যযুগে পড়বেন আর সিরাজ উদ-দৌলা বা লর্ড ক্লাইভ পড়বেন আধুনিক যুগে?

আরেক দিক থেকেও বিষয়টা দেখা যায়। সুলতান ইলতুৎমিস যখন মারা যান, তখন মেয়ে রাজিয়াকে দিল্লির শাসনভারের জন্য নির্বাচন করে যান। যথাক্রমে রাজিয়া সুলতান হন। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকে বা তার পরেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল বা প্রশাসনিক কর্তার পদে কোনো নারীর খোঁজ পাওয়া যায় না। এখন নারীর শাসনক্ষমতার নিরিখে বিচার করলে কোনটা আধুনিক আর কোনটা আধুনিক নয়? শুধু আগে জন্মেছেন বলেই কী সুলতান রাজিয়াকে মধ্যযুগের বৃত্তে পড়তে হবে?

সংবাদপত্র : আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার অন্যতম প্রধান উপাদান

আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মানে জাপান-কর্তৃক প্রবর্তিত ডাক টিকিট। আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার অন্যতম উপাদান হল ডাক টিকিট।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক পর্বে ভেঙে ভারত-ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টার মধ্যে প্রায়ই অতিসরলীকরণ আছে। 'যুগ' বলতে একটা বড়ো সময়কে বোঝায়। প্রতিটি যুগের মানুষ ও তার জীবনযাপনের নানারকম বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রাতারাতি পালটে যায় না। তাই সবসময় যুগ বদলের ধারাকে সময়ের হিসাব কষে ধরে ফেলা যায় না।

আর একটা জরুরি কথা হলো ইতিহাস থেকে বর্তমানের দূরত্ব। এই দূরত্ব সময়ের হিসাবে যত বেশি হবে, ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বাদ-বিতর্কের চরিত্র ততই বদলাবে। যেমন, সম্রাট অশোকের ভাবনাচিন্তায় কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রভাব কী? এই নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, সেই বিষয়টা মানুষের প্রতিদিনের জীবনে আজ আর তত প্রাসঙ্গিক নয়। তাই তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, সামাজিকভাবে সেই বিতর্ক ততটা জরুরি নয়।

পানিপতের প্রথম যুদ্ধ বিষয়েও কথাটা খানিকটা একইরকম বলা যায়। কিন্তু প্রশ্নটা যদি ওঠে যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভাজন কী কোনোভাবেই ঠেকানো যেত না? তাহলে প্রশ্নটা সামাজিকভাবেও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আজও ভারতবর্ষের অনেক মানুষ ঐ সময়ের দেশভাগের স্মৃতিতে কষ্ট পান। হয়তো তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে দেশভাগ নানারকম ছাপ ফেলেছিল। ফলে, প্রশ্নটা এক্ষেত্রে অনেক সরাসরি বর্তমান সমাজকে ছুঁয়ে যায়। তাই এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও নানা বিতর্ক রয়েছে। তেমনি সাধারণ মানুষেরও নানা বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক। ফলে দেশভাগ বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলে খুব নির্লিপ্তভাবে লেখা কঠিন। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ইতিহাসের বিশ্লেষণে প্রায়শই ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতামত ও ভাবনাচিন্তা বেশি বেশি করে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইতিহাসের সময় যত দূরের হয়, সেই সম্ভাবনা তত কমে।

ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসের উপাদান

আধুনিক ইতিহাস লেখার জন্য উপাদানও নানারকম। বর্তমানের তুলনায় আধুনিক ইতিহাসের সময়টা অনেক কাছাকাছি বলে বিভিন্ন উপাদান এখনও হাতের কাছে পাওয়া যায় । গত চার-পাঁচশো বছরের কাগজপত্র, বই , আঁকা ছবি এখনও ততটা নষ্ট হয়নি। তাছাড়া নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেইসব উপাদানকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা গেছে। সব মিলিয়ে পৃথিবী জুড়েই আধুনিক সময়ের ইতিহাস লেখার উপাদানের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। ভারত-ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশাসনিক কাগজপত্র, বই, ডায়েরি, চিঠি থেকে শুরু করে জমি বিক্রির দলিল বা রোজকার বাজারের ফর্দ — সবই ইতিহাসের উপাদান। আবার ছবি, মানচিত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র— কতরকমের জিনিস ব্যবহার হয় ইতিহাস লেখার কাজে।

তবে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হয়। ধরা যাক, কারো আত্মজীবনী থেকে তাঁর সময়ের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সোজাসুজি সেই

আত্মজীবনী ব্যবহার করলেই হবে না। কারণ, যিনি আত্মজীবনী লিখছেন, তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা থেকেই সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। ঐতিহাসিক যদি সেই ব্যাখ্যা পুরোপুরি মেনে নেন বিচার না করেই, তাহলে একপেশে হয়ে যায় বক্তব্য। কখনও বা পুরো ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যেতে পারেন ঐতিহাসিক। যেমন, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন তাঁর লেখা অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের জীবনীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব হিউমকেই দিয়েছেন। অথচ পরে দেখা গেছে যতটা কৃতিত্ব হিউমকে দেওয়া হয়, আদৌ ততটা কৃতিত্বের দাবিদার হিউম নন। ঐতিহাসিক যদি শুধু ওয়েডারবার্নের কথাই মেনে নিতেন, তাহলে এই নতুন বিশ্লেষণ পাওয়া যেত না। অর্থাৎ, সমস্ত উপাদানকেই প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে ভেঙেচুরে দেখতে হয় ঐতিহাসিককে।

ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্বের বিষয়ে জানার অন্যতম উপাদান ফোটোগ্রাফ। অর্থাৎ ক্যামেরায় তোলা ছবি। এইরকম ছবির অনেক সংগ্রহ থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছু জানা যায়। তবে ফোটোগ্রাফগুলিও পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক নয়। মানে আত্মজীবনী বা জীবনীর ক্ষেত্রে লেখক নিজের ইচ্ছামতো লিখতে পারেন। তেমনি ছবি যিনি তুলছেন, তাঁর দেখার উপরেই ক্যামেরার দেখা নির্ভর করে। ফলে একই বিষয়ের দু-জনের তোলা দুটি ছবির দু-রকম অর্থ দাঁড়াতে পারে।

নীচের ছবিটা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তোলা একটি ফটোগ্রাফ। ছবিতে গান্ধি ও সুভাষ হাস্যমুখর আলাপে ব্যস্ত। অথচ ঐ সময়ে নানা প্রসঙ্গে দু-জনের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। এমনকি পরের বছর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করেছিলেন। অথচ এই ছবি থেকে সেই সময়ে ঐ দুজনের সম্পর্কের সংঘাত বোঝা যায় না। ফলে ফটোগ্রাফের পিছনের ইতিহাস জানা না থাকলে, ফটোগ্রাফ নিজে সবসময় ঠিক মনোভাব প্রতিফলিত করে না।

প্রশাসনিক নথিপত্রের ক্ষেত্রেও এই দেখার পার্থক্যটা বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ব্রিটিশ সরকারের চোখে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ-আন্দোলনগুলি প্রায়শই 'হাঙ্গামা' বা 'উৎপাত' বলে ধরা পড়েছে। তাদের লেখা সরকারি নথিপত্রেও তেমনি বিশ্লেষণ চোখে পড়বে। অথচ ঐ আন্দোলনগুলি ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তি-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখলে সেগুলির অন্য মাত্রা চোখে পড়বে। তখন তিতুমির, বিরসা মুন্ডা, সিধু-কানহু-রা কোনো অংশেই আর 'হাঙ্গামাকারী' নন, বরং স্বাধীনতা সংগ্রামী।

এর থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে, ইতিহাসকে দেখা বা বিশ্লেষণ করাটা নির্ভর করে দেখার ও বোঝার ভঙ্গির উপরে। আর সেই দেখার ও বোঝার ভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা কিছু। সেইসবের মধ্যে সাম্রাজ্যের স্বার্থ, উপনিবেশ বিস্তারের আগ্রহ বা জাতীয়তাবাদের আদর্শ থাকতে পারে। তাহলে বোঝা দরকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ কাকে বলে।

সাম্রাজ্যবাদ একটি প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি শক্তিমান দেশ অথবা রাষ্ট্র আরেকটি তুলনায় দুর্বল দেশ অথবা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে তাকে নিজের দখলে আনে। দুর্বল দেশটির অথবা রাষ্ট্রের জনগণ, সম্পদ সব কিছুকেই শক্তিমান দেশ অথবা রাষ্ট্রটি নিজের প্রয়োজনমতো পরিচালনা করে। এর ফলে শক্তিমান যখন তার অধীন দুর্বলের ইতিহাস খুঁজতে যায়, তখন জেমস মিলের

নীচের ফটোগ্রাফটি বোম্বাইয়ের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের। ছবিতে ব্যক্তিদের (পুরুষ ও নারী) পোশাক, দাঁড়ানোর/বসার ভঙ্গি প্রভৃতি থেকে যাঁদের ছবি তোলা হচ্ছে, তাঁদের মনোভাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান প্রভৃতি বোঝা যায়। অতএব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফের গুরুত্ব অপরিসীম।

মতো পরিস্থিতি হয়। দুর্বলের ইতিহাসকে কেবল খাটো করে দেখার প্রবণতা থাকে। বলা শুরু হয়, দুর্বল শুধু দুর্বল নয়, অসভ্যও, তাই তার ইতিহাস নেই। কারণ ইতিহাস কেবল সভ্য মানুষের হয়। ফলে ইতিহাসহীন অসভ্য মানুষগুলো যাতে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যেই রেখে দেওয়া ভালো।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উপনিবেশবাদের যোগাযোগ স্পষ্ট। ধরা যাক ভারতের অর্থনীতি একসময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ মোতাবেক চলতো। বাংলায় নীল চাষ করা হতো ইংল্যন্ডের কাপড় কলে নীলের চাহিদা মাথায় রেখে। তাতে করে বাংলার ধান, পাট প্রভৃতি চাষ নষ্ট হতো। বাংলায় অনাহার, দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এই যে একটি অঞ্চলের জনগণ ও সম্পদকে অন্য একটি অঞ্চলের স্বার্থে ব্যবহার করা এটাই উপনিবেশেরও মূল কথা। ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে ভারতের কৃষিজ ফসল ব্রিটেনের স্বার্থে উৎপাদন হবে।

সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে ভারতের শিক্ষিত জনগণ ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যেও জোট বাঁধলেন। ইংরেজি শিক্ষা, সরকারি চাকরি পেলেও দেশীয় সমাজে শিক্ষিত জনগণ নিজেদের মতো করে নিজেদের দাবিগুলি নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। সেই চর্চা থেকে ইতিহাসও বাদ পড়ল না। মিলের ইতিহাসের যুক্তিকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্লেষণের বিপক্ষে ব্যবহার করা শুরু হলো। খোঁজা হলো প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস। দেখা গেল যেভাবে ব্রিটিশরা বলে ভারতের ইতিহাস নেই, তা ঠিক নয়। ইতিহাস আছে, শুধু বিভিন্ন উপাদান থেকে তাকে চেহারা দিতে হবে। সেই যে বঙ্কিম বলেছিলেন, আমি, তুমি সবাই ইতিহাস লিখব; সেই কাজটা শুরু হয়ে গেল।

গান্ধিকে নিয়ে এই ধরনের ছবি উত্তর ভারতে একসময় খুব ছাপা হতো। ছবিটিতে গান্ধিকে ভারতমাতার ও হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের ইতিহাস জানতে এ ধরনের ছবি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দেশের মানুষ যখন দেশের ইতিহাস লিখলেন, তখন বিভিন্ন ঘটনার অন্য বিশ্লেষণ হাজির হলো। সাম্রাজ্যের স্বার্থের উলটোদিকে দেশের চিন্তাও ইতিহাসে জায়গা পেতে শুরু করল। সিরাজ উদ-দৌলা নিরীহ ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক। ভারতীয় ঐতিহাসিক অঙ্ক কষে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন সেই অভিযোগ মিথ্যা। ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় তথা জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষণের দ্বন্দ্ব।

আগামী এক বছরে ইতিহাসের তথ্য, তত্ত্ব, ধারণার পাশাপাশি এই দ্বন্দ্বগুলোও চোখে পড়বে এই বইয়ের নানাস্তরে। তাঁর সঙ্গে প্রায় ২৫০ বছরের কালপর্বে কীভাবে বদলে গেল ভারতের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ও

মানুষের জীবনযাত্রা তার হদিশও পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে দেখা যাবে, ইতিহাস যেন আর দূরে থাকছে না। ঢুকে পড়ছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে বর্তমানকেও। পরিবারের একটু বয়স্ক অনেক সদস্যই সেই ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাই চারিয়ে যাবে বর্তমানে।

প্রশ্নটা, তার পরেও থেকে যায়, কেন পড়ব এত ইতিহাস? কেন জানব পুরোনো দিনের কথা? একটা গল্প বলা যাক। একদিন একটা রেল স্টেশনে দু-জন ব্যক্তির দেখা হলো। হঠাৎই। ট্রেন দেরি করেছিল আসতে তাই কথা বলছিলেন তাঁরা। কথা বলতে বলতে একসময়ে জানা গেল তাঁরা দু-জন একই পরিবারের মানুষ। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু অনেক দিন আগে দুটো পরিবার আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো যোগাযোগ ছিল না পরিবারদুটোর মধ্যে। আজ আর তাই তাঁরা একে অন্যকে আপনজন বলে চিনতে পারেননি।

নীচের ফটোগ্রাফটি দেশভাগের যন্ত্রণা ও নতুন ঠাঁই খোঁজার সংশয়দীর্ণ মানুষের ছবি। ছবিতে ব্যক্তিদের (পুরুষ ও নারী) চোখের ভঙ্গি থেকেই তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে।

গল্পটা যদি বাস্তব করে নেওয়া হয়? স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দুটো রাষ্ট্র একসময়ে ভারতবর্ষেরই আত্মীয় ছিল। দীর্ঘদিন তারা পাশাপাশি ছিল। অথচ একসময়ে তারা আলাদা হয়ে গেল। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার বাঁধন গেল আলাদা হয়ে। আজ তারা একে অন্যকে আত্মীয় বলে চিনতে পারে না। নিজের ফেলে আসা আত্মীয়তাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার জন্যই ইতিহাস পড়তে হয়। কেমন করে আত্মীয়রা আলাদা হয়ে গেল, তা বুঝতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে।

২ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

উপরের ছবিটির বাঁ-দিকের অংশে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বসে আছেন। ডানদিকের অংশে রয়েছে লর্ড কর্নওয়ালিসের একটি মূর্তি। ঔরঙ্গজেবের ছবিটির ও কর্নওয়ালিসের মূর্তিটির ভঙ্গির মধ্যে কী কোনো তফাৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? কর্নওয়ালিস দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে রোমান পোশাক। কেন কর্নওয়ালিসের মূর্তি বানানোর সময় তাঁকে রোমান পোশাক পরানোর কথা ভাবা হলো? ভাবো— একটা সূত্র দেওয়া রইল : রোমান সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যান। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান। এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৫০ বছরের। কিন্তু এই ৫০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরে খুব দ্রুত মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিও নষ্ট হতে থাকে। ফলে মুঘলদের পক্ষে তাদের সাম্রাজ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই মুঘলদের এই অবনতিকে বিভিন্ন সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা-ব্যর্থতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়। যদিও একটা সাম্রাজ্য তথা শাসনব্যবস্থা শুধু ব্যক্তি-সম্রাটের দক্ষতা-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না । তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে মুঘলদের সাম্রাজ্যিক অবনতিকে?

সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহ জাহানের সময় থেকেই মুঘল শাসন কাঠামোয় ছোটোবড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, বিশেষত শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বরং, তাঁদের নানা অযোগ্যতার ফলে সেই দুর্বলতাগুলো আরও বেশি মাথা চাড়া দিয়েছিল।

মুঘলদের সামরিক ব্যবস্থার অবনতি তেমনই একটা দুর্বলতা ছিল। বিশেষ কোনো সামরিক সংস্কার অষ্টাদশ শতকের মুঘল সম্রাটরা করেননি। ফলে, সাম্রাজ্যের

ভিতরের বিদ্রোহ হোক আর বাইরের আক্রমণ, দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা সেসবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। শিবাজী ও মারাঠাদের আক্রমণ মুঘল শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল। অন্যদিকে নাদির শাহের নেতৃত্বে পারসিক আক্রমণে (১৭৩৮-৩৯ খ্রি:) বা আহমদ শাহ আবদালির নেতৃত্বে আফগান আক্রমণে (১৭৫৬-৫৭ খ্রি:) দিল্লি শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি, জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থার সংকট মুঘলদের শাসন কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে। বিশেষত ভূমি রাজস্বের হিসেবে নানা গরমিল দেখা দেয়। এর নেতিবাচক প্রভাব সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উপরেও পড়েছিল। তাছাড়া ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য দলাদলি মুঘল দরবারের অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। দুর্বল সম্রাটেরা এক একটি অভিজাতপক্ষকে নিজের দলে টানার চেষ্টা করতেন। সব মিলিয়ে সম্রাট ও অভিজাতরা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার বদলে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রতি বেশি মনোযোগী হন।

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের গরমিল বাস্তবে চাপ তৈরি করেছিল কৃষি ব্যবস্থার উপর। সেই চাপের বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসবের ফলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শাসন কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলি একএকটি অঞ্চলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। তবে ঐ শক্তিগুলি সরাসরি মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করেনি। বরং মৌখিকভাবে মুঘল কর্তৃত্বের বৈধতাকে সকল আঞ্চলিক শক্তিই মেনে চলত। নিজেদের শাসনকে মান্যতা দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক শাসকেরা মুঘল সম্রাটের অনুমোদন চাইত। এমনকি অনেক আঞ্চলিক রাজ্যই নিজেদের প্রশাসনকে মুঘল প্রশাসনের ছাঁচেই গড়ে তুলেছিল। বাস্তবে অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান একধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। তাই মুঘল শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হলেও, মুঘল রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়েনি। বরং আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে তা টিকেছিল।

আঞ্চলিক শক্তিগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের। তার কোনোটা প্রতিষ্ঠা করেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত আঞ্চলিক প্রশাসকেরা। পাশাপাশি এমন কিছু রাজ্যও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, যারা আগে মুঘল রাষ্ট্রের অধীন কিন্তু স্বশাসিত ছিল। আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি শক্তি ছিল প্রধান। সেগুলি হলো বাংলা, হায়দরাবাদ ও অযোধ্যা। এই তিনটি আঞ্চলিক শক্তির প্রধান ছিলেন তিনজন মুঘল প্রাদেশিক প্রশাসক। তাঁরা কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিরোধিতা করেননি। যদিও নিজেদের অঞ্চলে তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল প্রায় চূড়ান্ত।

বাংলা

সুবা বাংলার রাজস্ব ঠিকমতো আদায় করার জন্য মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। সম্রাট বাহাদুর শাহর আমলেও মুর্শিদকুলি

ঐ পদে বহাল ছিলেন। দেওয়ান পদে মুর্শিদকুলির নিয়োগ পাকাপাকি করে দেন সম্রাট ফাররুখশিয়র। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলিকে বাংলার নাজিমপদ দেওয়া হয়। ফলে দেওয়ান ও নাজিমের যৌথ দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সুবা বাংলায় মুর্শিদকুলির ক্ষমতা চূড়ান্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থান ঘটে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে।

টুকরো কথা

মুর্শিদকুলি খান-কে ঔরঙ্গজেবের চিঠি

সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর মুনশি ইনায়েতউল্লাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলিকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই চিঠিগুলি থেকে বাংলার দেওয়ানের প্রতি মুঘলসম্রাটের মনোভাব বোঝা যায়। মূল চিঠিগুলি ফারসিতে লেখা। তেমনই একটি চিঠিতে লেখা হয়েছিল:

"বাদশাহের আজ্ঞা অনুসারে লিখিত হইতেছে যে— এখন বিহার প্রদেশের দেওয়ানের পদও আপনাকে অর্পণ করা হইয়াছে, সুতরাং আপনি স্বয়ং উড়িষ্যা যান ইহা ভাল নহে। তথায় এক প্রতিনিধি (নায়েব) রাখিয়া জাহাঙ্গীর-নগর (ফিরিয়া) আসিবেন, কারণ যুবরাজ (আজীম্-উশ্-শান্) কুমার (ফরোখ্সিয়রকে ঢাকায়) রাখিয়া নিজে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন। আপনার অনেক কার্য্য, সুতরাং যথা হইতে সব স্থানের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এরূপ কেন্দ্রস্থানে আপনার বাস করা উত্তম। .... বাদশাহ হুকুম করিতেছেন যে— উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ (সুবা), এক কোণে স্থিত। সর্ব্বদাই ইহার পৃথক শাসনকর্ত্তা থাকিত, এবং আপনার কার্য্যস্থলের (বাঙ্গলার) সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এই প্রদেশের অবস্থা লিখিয়া জানাইবেন।" জাহাঙ্গীরনগর বলতে ঢাকা বোঝানো হয়েছে। আরেকটি চিঠিতে লেখা হয়েছে:

"ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের হুকুমে এই মন্ত্রীবরকে লেখা হইয়াছে যে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার সরকারী খাজনা যাহা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ আপনি বাদশাহকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, ও তৎসঙ্গে অন্যান্য অধিক টাকা যাহা সংগ্রহ হইয়া থাকিবে, একত্রে যত দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠাইবেন। ...... যদি আপনি পূর্ব্বে প্রেরিত আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত টাকা সদরে রওনা করিয়া থাকেন, ভালই; নচেৎ এই পত্র পাইবামাত্র ঐ টাকা এবং অপর যাহা-কিছু আদায় হইয়াছে তাহা সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সঙ্গে হুজুরে প্রেরণ করিবেন। জানিবেন যে বিলম্ব অবৈধ, কারণ এ বিষয়ে বাদশাহ অত্যন্ত অধিক তাকিদ করিতেছেন। নিশ্চয়ই এই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন।"

এই চিঠিটির থেকে ঔরঙ্গজেবের শেষ কয়েক বছরের রাজত্বকালে টাকার অভাব এবং সুবা বাংলা থেকে পাঠানো রাজস্বের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আরেকটি চিঠিতে মুর্শিদকুলিকে লেখা হয়েছে:

"আপনি বাদশাহী রাজস্ব সংগ্রহে ..... পরিশ্রম করিতেছেন, ... এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যে বাদশাহের স্বহস্তে লিখিত কয়েক ছত্র সহ এক ফর্মান আপনার নামে প্রেরিত হউক, তাহা সব বাদশাহ অবগত হইলেন। সম্রাট অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে এক উজ্জ্বল সম্মানসূচক পরিচ্ছদ (খেলাৎ) এবং স্বহস্তাক্ষরে ভূষিত ফর্মান প্রদান করিলেন।

নিশ্চয়ই এই সব অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিতে ও রাজস্ব সংগ্রহ ও হুজুরে প্রেরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিশ্রম করিবেন। ..... অতি শীঘ্র খেলাৎ ও ফর্মান আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।"

[উদ্ধৃত চিঠির অংশগুলি মূল ফারসি থেকে বাংলায় তরজমা করেছিলেন যদুনাথ সরকার। তাঁর 'মুর্শীদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

মুর্শিদকুলির আমলে বাংলায় একদল ক্ষমতাবান জমিদারশ্রেণি তৈরি হয়। তাঁরা নাজিমকে নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার বদলে নিজেদের অঞ্চলে ক্ষমতা ভোগ করতেন। মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসার পক্ষে অনুকূল ছিল। স্থল ও সমুদ্রপথে নানান দ্রব্য সুবা বাংলা থেকে রফতানি করা হতো। হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনীয় বণিকরাই ঐ ব্যবসায় প্রভাবশালী ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ী উমিচাঁদ ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজিদ ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। এইসব ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। শাসকেরা এদের সহায়তার ওপর নির্ভর করত। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মূলধন বিনিয়োগকারী জগৎ শেঠের নাম করা যায়। সুবা বাংলার কোশাগার ও টাঁকশাল জগৎ শেঠের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণেই চলত।

টুকরো কথা

জগৎ শেঠ

মুর্শিদাবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বণিকদের বেশ প্রভাব ছিল। এদের *বণিকরাজা* বলা হতো। এই বণিকরাজাদের মধ্যে প্রবীণ ছিলেন উমিচাঁদ, খোদা ওয়াজিদ এবং জগৎ শেঠ। মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী উদ্যোগে জগৎ শেঠ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থান থেকে হিরাপদ শাহ পাটনায় চলে যান। তাঁর বড়ো ছেলে মানিকচাঁদ ঢাকায় মহাজনি কারবার শুরু করেন। মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে মানিকচাঁদের সম্পর্ক ভালো ছিল। সেই সূত্রেই মানিকচাঁদ ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে ব্যবসা শুরু করেন। মানিকচাঁদের পর তাঁর ভাগ্নে ফতেহচাঁদ ব্যবসার হাল ধরেন। ফতেহচাঁদ মুঘল সম্রাটের থেকে *জগতের শেঠ* বা *জগৎ শেঠ* উপাধি পান। সেই উপাধি বংশানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে। **অর্থাৎ জগৎ শেঠ কোনো একজনের নাম নয়, নির্দিষ্ট একটি বণিক পরিবারের উপাধি।**

নিজেদের মুদ্রা তৈরি, মহাজনি ব্যবসা প্রভৃতির ফলে জগৎ শেঠের বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল। এক ধরনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল জগৎ শেঠদের হাত ধরে। অর্থাৎ বাংলায় অর্থনীতির উপর জগৎ শেঠদের নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে বাংলার নবাবের দরবারেও তাদের প্রভাব ছিল। ফলে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও সিরাজ-বিরোধী উদ্যোগে জগৎ শেঠদের নিজের দলে টানতে চেয়েছিল। মির জাফর নিজেও জগৎ শেঠদের পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন। ফলে পলাশির যুদ্ধের পর জগৎ শেঠদের সম্মতিতে ব্রিটিশ কোম্পানি মির জাফরকেই নবাব নির্বাচি ত করে।

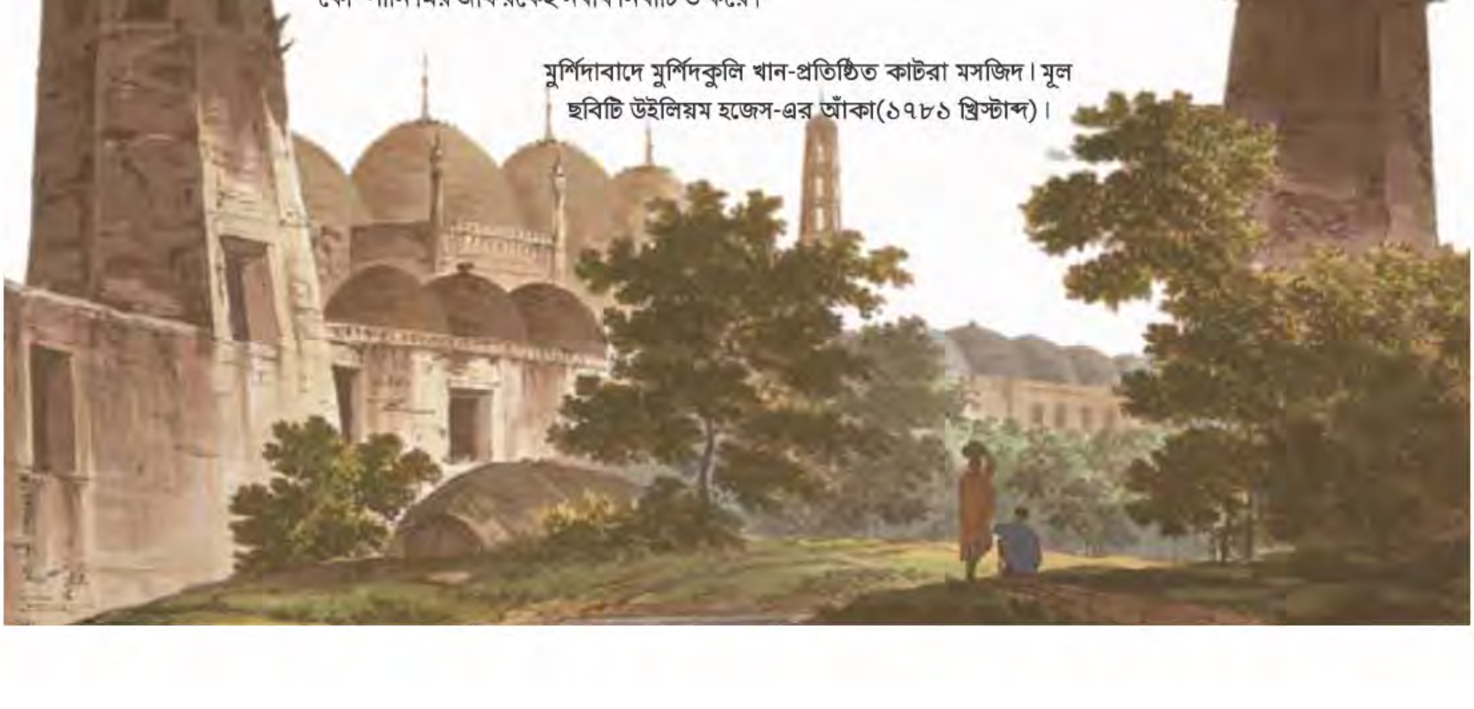

মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খান-প্রতিষ্ঠিত কাটরা মসজিদ। মূল ছবিটি উইলিয়ম হজেস-এর আঁকা(১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি মারা যান, তখনও মুঘলদের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ভালো ছিল। মুর্শিদকুলির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ বাধে। সেই পরিস্থিতিতে জগৎ শেঠ ও কয়েকজন ক্ষমতাবান জমিদারের মদতে সেনাপতি আলিবর্দি খান সুবা বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

বাস্তবে আলিবর্দি খানের শাসনকালে মুঘলদের হাত থেকে সুবা বাংলার অধিকার বেরিয়ে যায়। শাসনতান্ত্রিক কোনো খবরাখবরই দিল্লির মুঘল সম্রাটকে জানানো হতো না। তাছাড়া নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোর ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। যদিও মুঘল কর্তৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হতো, তবুও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আলিবর্দি কার্যত একটি স্বশাসিত প্রশাসন চালাতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি মারা যান। তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলা নতুন নবাব হন। কিন্তু দ্রুতই দরবারের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের সংঘাত বাঁধে। তার পরিণতিতে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছিল।

টুকরো কথা

বাংলায় বর্গিহানা

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে—ছড়াটি প্রায় সবারই জানা। বাংলায় মারাঠা বা বর্গি আক্রমণ ছিল নবাব আলিবর্দির সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মারাঠারা বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ ও আক্রমণ চালিয়ে ছিল। সেই আক্রমণের স্মৃতি নানা ছড়া ও প্রবাদে *বর্গিহানা* বলে পরিচিত হয়েছে।

বর্গিহানায় ভুক্তভোগী বাঙালি কবি গঙ্গারাম বর্গিদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন— ***"যেই মাত্র পুনরপি ভাস্কর আইল।/তবে সরদার সকলে ডাকিয়া কহিল—/'স্ত্রীপুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।/তলয়ার খুলিয়া সব তাদের কাটিবা।।'/এতেক বচন যদি বলিল সরদার।/চতুর্দ্দিকে লুটে কাটে বোলে 'মার মার'।।"***

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায় বর্গিরা। নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদও বর্গি আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায়নি। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির একটি শর্তে বলা হয় উড়িষ্যার জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখা নদী সুবা বাংলার সীমানা। মারাঠারা সেই সীমানা ভবিষ্যতে পার করবে না। মারাঠা হানার ফলে বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত ছেড়ে অসংখ্য মানুষ পূর্ব, উত্তর বাংলা এবং কলকাতায় চলে যায়। কলকাতায় অনেকে ব্রিটিশ বণিকদের আশ্রয় পেয়েছিল। নবাবের বিকল্প হিসেবে ব্রিটিশ কোম্পানি হয়ে উঠেছিল 'রক্ষাকারী'। বর্গিহানা আটকাবার জন্য কলকাতায় খাল খোঁড়া হয়েছিল। তাকে মারাঠাখাল বলা হতো। কলকাতার ব্রিটিশ-কুঠির চিঠিপত্রে তার বর্ণনা রয়েছে:

"কলিকাতা কাসিমবাজার ও পাটনায় আমাদের (*ব্রিটিশ*) কারবার কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। .... কলিকাতায় এক শত বকসরিয়া সৈন্য নিযুক্ত করা হইল, এবং .... স্থানীয় সাহেবদের লইয়া এক মিলিশিয়া গঠন করা হইল।.... কলিকাতার বণিকগণ প্রস্তাব করিল যে তাহাদের বাড়ীঘর রক্ষা করিবার জন্য তাহারা নিজের খরচে সহর ঘিরিয়া একটা খাল খুঁড়িবে। আমাদের কৌউন্সিল.... এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া চার জন প্রধান লোকের জামিনে তিন মাসে শোধ দিবার সর্ত্তে ২৫,০০০ টাকা ধার দিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৭৪৪এর মধ্যে ঐ খাল ('মারাঠা ডিচ') ফোর্টের দরওয়াজা হইতে হ্রদ (সল্টলেক)এর দিকে যাইবার বড় রাস্তা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন গোবিন্দপুরে কোম্পানীর সীমানা পর্য্যন্ত তাহা লইয়া যাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।"

[গঙ্গারাম-লিখিত *মহারাষ্ট্র-পুরাণ*-এর অংশ ও ব্রিটিশ-কুঠির চিঠির উদ্ধৃত অংশগুলি যদুনাথ সরকার-এর 'বর্গীর হাঙ্গামা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)। ব্রিটিশ-কুঠির চিঠিতে যে ফোর্ট-এর কথা রয়েছে, সেটি এখনকার কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসের জায়গায় ছিল।]

মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি চিন কুলিচ খান নিজাম-উল-মুলক

হায়দরাবাদ

মুঘল দরবারে একজন শক্তিশালী অভিজাত ছিলেন মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে চিন কুলিচ খান উপাধি দেন। পরে তিনি সম্রাট ফাররুখশিয়রের থেকে নিজাম-উল-মুলক এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের থেকে আসফ ঝা উপাধি নিয়ে ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মুঘল প্রাদেশিক শাসক মুবারিজ খান হায়দরাবাদে প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো ছিলেন। ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে আসফ ঝা মুবারিজ খানকে হারিয়ে দেন এবং পরের বছর নিজেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে হায়দরাবাদ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে স্থায়ীভাবেই হায়দরাবাদে থেকে প্রশাসন চালাতে থাকে নিজাম। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নিজামের শাসনে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কর্তৃত্বকে হায়দরাবাদ অস্বীকার করেনি। মুঘল সম্রাটের নামেই হায়দরাবাদের মুদ্রাগুলি চলত। এমনকি সম্রাটের নামে খুতবাও পাঠ করা হতো। তবে বাস্তবে প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজাম স্বাধীনভাবেই চালাতেন। মুঘল সম্রাটের কাছে কোনো খবরাখবর পৌঁছোত না।

হায়দরাবাদি প্রশাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কাঠামো বজায় থাকলেও, ভিতরে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। যেমন জায়গিরগুলি ক্রমে বংশগত হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনে অনেক নতুন লোক যুক্ত হয়েছিল। বস্তুত হায়দরাবাদে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল।

সফদর জং

অযোধ্যা

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খানের নেতৃত্বে অযোধ্যা একটি স্বশাসিত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। মুঘল প্রশাসক হিসেবে সাদাৎ খানের দায়িত্ব ছিল অযোধ্যার স্থানীয় রাজা ও গোষ্ঠীর নেতাদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করা। দ্রুতই সেই কাজে সফল হওয়ার জন্য মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ সাদাৎ খানকে বুরহান-উল মুলক উপাধি দেন। মুঘল সম্রাটকে দিয়ে নিজের জামাই সফদর জং-কে অযোধ্যার প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করান সাদাৎ খান। পাশাপাশি অযোধ্যার দেওয়ানের দফতরকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে ফেলেন তিনি। অযোধ্যার রাজস্ব বিষয়ক কোনো খবরাখবরই মুঘল কোশাগারে পাঠানো হতো না।

সাদাৎ খান জায়গিরদারি ব্যবস্থাতে আঞ্চলিক অনভিজাত লোকেদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। অযোধ্যা অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য খুবই উন্নত ছিল। সাদাৎ খানের সমর্থক এক নতুন শাসকগোষ্ঠী তৈরি হয় অযোধ্যায়। তাদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান, আফগান ও হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় বেশি। তবে মুঘল দরবারের সঙ্গে অযোধ্যার সম্পর্ক সাদাৎ খান শেষ করে দেননি। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খান মারা যান। ততদিনে অযোধ্যায় প্রায় স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত কিছুতেই মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হতো।

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সফদর জং মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে সুজা উদ-দৌলা অযোধ্যার শাসক হন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের আগে প্রায় দশ বছর অযোধ্যা অঞ্চলে সুজার কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত।

বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের বিবর্তন

মুর্শিদকুলি খানের সময় বাংলায় বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য কোম্পানি ব্যবসা করত। সেগুলির মধ্যে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানি তিনটি ছিল বেশি ক্ষমতাশালী। তাদের মধ্যে আবার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজিক উদ্যোগ ছিল সব থেকে বেশি। নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খান বিদেশি বণিকদের সঙ্গে সচরাচর বিরোধিতায় যেতেন না। কিন্তু নিজের অধিকার ও কর্তৃত্ব যাতে কোনোভাবে বিদেশি কোম্পানির দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে নবাব সচেতন ছিলেন। বাস্তবে মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছিল ফাররুখশিয়রের ফরমান দ্বারা।

টুকরো কথা

ফাররুখশিয়রের ফরমান

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র একটি আদেশ বা *ফরমান* জারি করেছিলেন। সেই ফরমান মোতাবেক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ব্রিটিশ কোম্পানি বছরে মাত্র ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে। কিন্তু তার জন্য কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না। ব্রিটিশ কোম্পানি কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে ৩৮ টি গ্রামের জমিদারি কিনতে পারবে। কোম্পানির পণ্য কেউ চুরি করলে তাকে বাংলার নবাব শাস্তি দেবেন ও কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে অনুমতি পত্র থাকলেই সেই জাহাজ অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। তাছাড়া বাংলার নবাবের মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল প্রয়োজন মতো কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে।

লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস। মূল ছবিটি জোসেফ হসমার শেফার্ড-এর আঁকা (১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

মুঘল সম্রাট
ফাররুখশিয়র

ফাররুখশিয়রের ফরমান বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় অবাধ বাণিজ্যের পথ খুলে দিয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমি তৈরি করেছিল ঐ ফরমান।

সুবা বাংলায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করলেও, মুর্শিদকুলি খান মুঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন। ফলে কোম্পানিকে দেওয়া ফররুখশিয়রের ফরমান সরাসরি নাকচ করার অধিকার তার ছিল না। কিন্তু ঐ ফরমান ব্যবহারের ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির বাড়তি বাণিজ্যিক সুবিধার প্রসঙ্গটি মুর্শিদকুলির পছন্দও ছিল না। ফলে গোড়া থেকেই ফরমান-প্রদত্ত কোম্পানির অধিকারকে তিনি সীমিত করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি ঘোষণা করেন যেসব বাণিজ্য দ্রব্য সরাসরি সমুদ্র পথে আমদানি-রফতানি হবে কেবল সেগুলির শুল্কই মকুব হবে। কিন্তু দেশের ভিতরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় নীতি প্রযোজ্য হবে না। ব্রিটিশদের কলকাতা সংলগ্ন গ্রাম কেনার ব্যাপারেও মুর্শিদকুলির অমত ছিল। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের সুবিধাও তিনি কোম্পানিকে দেননি।

ফাররুখশিয়রের ফরমানে বলা ছিল কেবল ব্রিটিশ কোম্পানি পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় পাবে। অথচ কোম্পানির বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসাতেও দস্তকের অপব্যবহার করে নবাবের শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। সে বিষয়কে কেন্দ্র করে মুর্শিদকুলির সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া নবাবের অনেক কর্মচারীও ব্রিটিশ বণিকদের থেকে নানা অজুহাতে টাকা পয়সা দাবি করত। এমন কি সেই দাবি না মেটালে ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর মাঝেমধ্যে অত্যাচার করত নবাবের কিছু কর্মচারী। তেমনি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত জগৎ শেঠদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে যায়। কিন্তু বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত সেখানেই হয়েছিল।

বাংলার নবাব
আলিবর্দি খান

মুর্শিদকুলির মতো আলিবর্দি খানও বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তিনিও মনে করতেন বাংলার অর্থনীতি এর ফলে সমৃদ্ধ হবে। তবে বিদেশি বণিক ও কোম্পানিগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। আলিবর্দি খেয়াল রাখতেন যাতে ঐ বণিকেরা কেবল ব্যবসায়ী হিসেবে বাংলায় থাকে। নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরোধী হিসেবে বিদেশি বণিক কোম্পানির উত্থান যাতে না হয়, তার জন্য আলিবর্দি সজাগ থাকতেন। পাশাপাশি বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বাহক ব্রিটিশ বণিকদের যাতে কোনো জুলুমের মুখে না পড়তে হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতেন নবাব। বস্তুত বিদেশি বণিকদের বাংলা থেকে হটিয়ে দেওয়ার চিন্তা আলিবর্দি খানের ছিল না।

তবে বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যের বিষয়ে উৎসাহ দেখালেও, বণিক কোম্পানিগুলি যাতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করে, সে বিষয়ে আলিবর্দির কড়া নজর ছিল। তার ফলে বাংলায় ব্রিটিশ ও ফরাসি কোম্পানির মধ্যে সরাসরি সংঘাত বাঁধেনি। ঐ দুই কোম্পানিকেই বাংলায় দুর্গ তৈরি করতে বাধা দিয়েছিলেন আলিবর্দি। তাঁর

যুক্তি ছিল বণিকদের দুর্গের কী প্রয়োজন? তাছাড়া তাদের নিরাপত্তার জন্য নবাব নিজেই উদ্যোগী ছিলেন।

১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের সময়ে আলিবর্দি খান ব্রিটিশ কোম্পানির থেকে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। সেই টাকা দিতে কোম্পানি অস্বীকার করে। তাই নিয়ে নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। পরে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি আর্মেনীয় বণিকদের জাহাজ আটকে রাখার ফলে আলিবর্দির সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত বাঁধে। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ভয় দেখিয়ে আর্মেনীয় জাহাজগুলি রক্ষা করেন আলিবর্দি।

নিজে করো

৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্রটির মতো একটি মানচিত্র আঁকো। তাতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের আঞ্চলিক শক্তিগুলির অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করো।

সিরাজ উদ-দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : পলাশির যুদ্ধ

আলিবর্দির উত্তরাধিকারী হিসেবে সিরাজ উদ-দৌলার ক্ষমতা লাভ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। সিরাজের আত্মীয়দের অনেকেই এবং আলিবর্দি খানের *বক্সি* বা সেনাপতি মির জাফরও সিরাজের বিপক্ষে ছিলেন। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেও সিরাজের সম্পর্ক গোড়া থেকেই ভালো ছিল না। নবাব হওয়ার কিছু দিন পরেই একের পর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ তৈরি হয়।

টুকরো কথা

সিরাজের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের কারণ: খোজা ওয়াজিদকে লেখা চিঠি

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে আর্মেনীয় বণিক খোজা ওয়াজিদকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে সিরাজ ব্রিটিশদের সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মনোভাবের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন। চিঠিটিতে লেখা ছিল:

''ইংরাজ তাড়াইব। আমার রাজ্য হইতে ইংরাজ তাড়াইবার তিনটি যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য আছে। (১) প্রথম কারণ এই যে, — উহারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে ; সুবৃহৎ পরিখা খনন করিয়াছে; তাহা বাদশাহী সাম্রাজ্যের চির-প্রচলিত আইন কানুনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানাবলীর বিপরীত কার্য। (২) দ্বিতীয় কারণ,— কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য ''দস্তক'' নামক যে পরোয়ানা পাইবার অধিকারী, উহারা তাহার অপব্যবহার করিয়া, অনধিকারীকে ''দস্তকের'' ফললাভ করিতে দিয়া বাদশাহী শুল্কের ক্ষতি করিতেছে। (৩) তৃতীয় কারণ,— যে সকল বাদশাহী কর্মচারী কৃতকার্যের নিকাশ দিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের মতলব করে, উহারা তাহাদিগকে নিজ অধিকার মধ্যে আশ্রয় দিয়া, ন্যায় বিচারের বাধা প্রদান করিতেছে।'' সিরাজ ঐ চিঠিতে আরও লিখেছিলেন:

''এই সকল কারণে, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবারই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। তবে যদি ইহারা এই সকল অন্যায় আচরণ দূর করিবার জন্য অঙ্গীকার করে এবং নবাব জাফর খাঁর (মুরশিদকুলি খাঁর) আমলে অন্যান্য বণিক যে নিয়মে বাণিজ্য করিত, সেই নিয়মে বাণিজ্য করিতে সম্মত হয়, ক্ষমা করিব, দেশেও থাকিতে দিব। অন্যথা শীঘ্রই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।''

বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলা

[সিরাজের চিঠির উদ্ধৃত অংশগুলি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থের 'কলিকাতা অবরোধ' অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

শেষপর্যন্ত নবাবের সেনাবাহিনী কলকাতার কাশিমবাজারের ব্রিটিশ কুঠি আক্রমণ করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন নবাব-বাহিনী ব্রিটিশদের হারিয়ে কলকাতা দখল করে। রজার ড্রেক ও তার সহযোগীরা কলকাতার দক্ষিণে ফলতায় পালিয়ে যান। কলকাতা দখল করে সিরাজ তার নাম দেন *আলিনগর*। কোম্পানির কর্তাব্যক্তি হলওয়েল প্রচার করেছিলেন যে কলকাতা দখল করে সিরাজ নাকি ১৪৬ জন ব্রিটিশ নরনারীকে একটি ছোটো ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন। তার ফলে অনেক বন্দি মারা যায়। এই ঘটনাকে 'অন্ধকূপ হত্যা' বলা হয়। যদিও এই ঘটনা আদৌ ঘটেছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'অন্ধকূপ হত্যা'কে অতিরঞ্জন বলে প্রমাণ করেছিলেন।

টুকরো কথা
অন্ধকূপ হত্যা

"যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ-কারাগারে জীবনবিসর্জন করিলেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ-হত্যার নাম পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

রণপলায়িত ইংরাজবীরপুরুষগণ পল্‌তার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল গুপ্তমন্ত্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। .... মাদ্রাজের ইংরাজদরবারের অনুরোধ রক্ষার্থে দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। .... ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া পলাশিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র সামরিক লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই! সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদিগের যে আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।

....

হলওয়েল মনুমেন্ট। মূল রঙিন ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী কবে কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,—সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য-পরিপূর্ণ! হলওয়েল সাহেব তাহার প্রথম প্রচারক।

....

হলওয়েল যে কারাগৃহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছিল, তাহা ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ ফিট প্রস্থ। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণকক্ষে ১৪৬ জন নরনারী কিরূপে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্পলোকেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন! এক একজন মানুষের জন্য অন্ততঃ ৬ ফিট দীর্ঘ, ২ ফিট প্রস্থ এবং ২ফিট বেধসমন্বিত স্থানের আবশ্যক হইলে, ওরূপ সংকীর্ণকক্ষে ৮১ জনের অধিক লোকের কিছুতেই স্থানসংকুলান হইতে পারে না। অথচ তাহারই মধ্যে ১৪৬ জন নরনারী কেমন করিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল? অল্পায়তন গৃহকোটরে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৪৬ জন নরনারীকে কারারুদ্ধ করাই অন্ধকূপ-হত্যার সর্বপ্রধান কলঙ্ক;— সে কলঙ্ক কি নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা সর্বথা কাল্পনিক কলঙ্ক নহে? অথচ জ্ঞানগর্বিত বৃটিশজাতি ইহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, সাশ্রুনয়নে হলওয়েলের কল্পিত কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়া, আজিও কত না হা হুতাশ করিতেছেন!"

[অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'অন্ধকূপ-হত্যা—রহস্যনির্ণয়' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতাংশটি নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

যদিও কলকাতায় সিরাজের অধিকার বেশি দিন টেকেনি। দ্রুতই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ বাহিনী ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আবার দখল করে নেয়। ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে বাংলারা নবাব সন্ধি করতে বাধ্য হন। *আলিনগরের সন্ধি*র ফলে ব্রিটিশ কোম্পানি তার বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরে পায়। নবাব ব্রিটিশ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেন। তাছাড়া কলকাতায় নিজের দুর্গ তৈরি করা শুরু করে ব্রিটিশ কোম্পানি। এমনকি নিজেদের *সিক্কা* (মুদ্রা) তৈরি করার ক্ষমতাও তারা পায়। বাস্তবে আলিনগরের সন্ধি বাংলার নবাবের পক্ষে অসম্মানের ও ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। ক্রমেই ব্রিটিশ কোম্পানির সিরাজ-বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে সিরাজ উদ-দৌলার সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের বিবাদ স্পষ্ট হয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির বাহিনী নবাবের বাহিনীকে হারিয়ে দেয়। মির জাফর সেই যুদ্ধে মূলত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

টুকরো কথা
নবাব মির জাফর ও পলাশির লুণ্ঠন

পলাশির যুদ্ধের পরে রবার্ট ক্লাইভ মির জাফরকে বাংলার নবাব হিসেবে নির্বাচন করেন। তার বিনিময়ে মির জাফরের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির কতগুলি চুক্তি হয়েছিল। সেইসব চুক্তি মোতাবেক বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির অবাধ বাণিজ্য চালু হয়। পাশাপাশি টাকা তৈরির অধিকারও কোম্পানি লাভ করে। ২৪ পরগনা জেলার জমিদারি ও সেখান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে সামরিক খরচ মেটানোর অধিকার কোম্পানিকে দেওয়া হয়। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। কলকাতার উপরে নবাবের যাবতীয় অধিকার নস্যাৎ হয়ে যায়।

বস্তুত নবাব মির জাফরকে সহায়তা করার বিনিময়ে ব্রিটিশ কোম্পানি অবাধে সম্পদ হস্তগত করতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজের কলকাতা আক্রমণের অজুহাতে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নেয় কোম্পানি। তার উপরে ক্লাইভ সহ কোম্পানির উঁচু পদাধিকারীরা মির জাফরের থেকে প্রচুর সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছিলেন। সব মিলিয়ে পলাশির যুদ্ধের পরে পরে প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পদ মির জাফরের থেকে আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানি। কোম্পানির তরফে এই অর্থ আত্মসাৎকে *পলাশির লুণ্ঠন* বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কোশাগার এই লুণ্ঠনের ফলে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

পলাশির যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ ও মির জাফরের সাক্ষাৎ। মূল রঙিন ছবিটি ফ্রান্সিস হেয়্যান-এর আঁকা।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে রবার্ট ক্লাইভ ইংলন্ডে ফিরে যান। সেইসময় ব্রিটিশ কোম্পানির অনেক কর্তাব্যক্তি মির জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোম্পানির অর্থনৈতিক দাবি মেটাতে মির জাফর অপারগ ছিলেন। ফলে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মির জাফরকে সরিয়ে তার জামাই মির কাশিমকে কোম্পানি বাংলার নবাব পদে বহাল করে।

মির কাশিম ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : বক্সারের যুদ্ধ

রবার্ট ক্লাইভ

মির কাশিম

ব্রিটিশ কোম্পানির সহায়তায় নবাব পদ পাওয়ার ফলে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার সম্পদ কোম্পানির আধিকারিকদের দিয়েছিলেন মির কাশিম। তাছাড়া বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারির অধিকারও মির কাশিম ব্রিটিশ কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। ফলে গোড়ায় মির কাশিমকে নিজেদের বশংবদ হিসাবেই ভেবেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। বাংলার রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের বদলে মুঙ্গেরকে বেছে নিয়েছিলেন মির কাশিম। পাশাপাশি নবাবের পুরোনো সৈন্য বাহিনীকে খারিজ করে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। এমনকি ক্ষমতাবান জগৎ শেঠদের থেকেও দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন মির কাশিম। তবে গোড়ায় ব্রিটিশ কোম্পানি মির কাশিমের পদক্ষেপগুলি নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিল না। ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মির কাশিমের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ শুরু হয়।

কোম্পানির বণিকদের তরফে বেআইনি ব্যবসার ফলে বাংলার অর্থনীতি সমস্যার মুখে পড়েছিল। একদিকে কোম্পানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় নবাবের প্রাপ্য রাজস্বে ঘাটতি পড়েছিল। অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য বিদেশি বণিক গোষ্ঠীও ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নবাবের কাছে নালিশ জানাতে থাকে। শেষপর্যন্ত নবাব দেশীয় বণিকদের উপর থেকেও বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেন। ফলে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় বণিকরা রক্ষা পেলেও নবাবি কোশাগার অর্থসংকটের মুখে পড়ে।

টুকরো কথা
বক্সারের যুদ্ধ ও দেওয়ানি লাভ

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মির কাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সরাসরি সংঘাত শুরু হয়। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরের যুদ্ধে মির কাশিম কোম্পানির কাছে হেরে যান। শেষ অবধি বাংলা ছেড়ে অযোধ্যায় পালিয়ে যান মির কাশিম। কোম্পানি মির জাফরকে আবার বাংলার নবাব হিসেবে বেছে নেয়। তবে অযোধ্যার শাসক সুজা উদ দৌলা ও দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে নিয়ে মির কাশিম ব্রিটিশ-বিরোধী জোট গঠন করেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঐ যৌথ বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধকে *বক্সারের যুদ্ধ* বলা হয়। কোম্পানির বাহিনী যুদ্ধে জিতে যায়। মুঘল সম্রাট কোম্পানির সঙ্গে আপস রফা করেন। সুজা উদ-দৌলা ও মির কাশিম পালিয়ে যান।

পলাশির যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধ জয়ে তা আরও সফল হয়। বাংলার উপর কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়েছিল। তাছাড়া অযোধ্যার শাসকের পরাজয়ের ফলে প্রায় পুরো উত্তর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি দিল্লির মুঘল সম্রাটকে হারিয়ে দেওয়ার ফলে আনুষ্ঠানিক মুঘল সার্বভৌমত্বও সমস্যার মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দিতে বাধ্য হন।

রবার্ট ক্লাইভকে দেওয়ানির সনদ দিচ্ছেন সম্রাট শাহ আলম। মূল ছবিটি বেঞ্জামিন ওয়েস্ট-এর আঁকা (আনু. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)

দেওয়ানির অধিকার ও দ্বৈত শাসন

বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানি জিতে যাওয়ার সম্ভবত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় লর্ড ক্লাইভ আবার বাংলায় ফিরে আসেন। ততদিনে মির জাফর মারা গিয়ে তাঁর ছেলে নজম উদ-দৌলা বাংলার নবাব হয়েছেন।

ক্লাইভ অবশ্য বক্সারের যুদ্ধ জয়ের সুবিধাকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত উত্তর ভারতের ক্ষমতা সরাসরি দখল না করে মুঘল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানায় কোম্পানি। সেইমতো দ্বিতীয় শাহ আলম ও সুজা উদ-দৌলার সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানি দুটি চুক্তি করতে উদ্যোগী হয়। সেই মোতাবেক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে দুটি চুক্তি হয়। ঐ চুক্তিগুলি অনুসারে কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে সুজা উদ-দৌলা অযোধ্যার শাসনভার ফিরে পান। কেবল কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল অযোধ্যা থেকে আলাদা

করে মুঘল বাদশাহের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাদশাহ শাহ আলম দিল্লির অধিকার ফিরে পাওয়ার বদলে একটি ফরমান জারি করেন। সেই ফরমান অনুযায়ী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে দেওয়া হয়। তার বদলে কোম্পানি শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে।

টুকরো কথা

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

দেওয়ানির অধিকার পাওয়ার ফলে দ্রুতই ভারতবর্ষে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল। মির কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোম্পানির অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। দেওয়ানির অধিকার থেকে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল কোম্পানি। তাছাড়া সুবা বাংলার রাজস্ব আদায় করার আইনি অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলায় এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কায়েম হয়। বাস্তবে বাংলায় দুজন শাসক তৈরি হয়। একদিকে রাজনৈতিক ও নিজামতের দায়িত্ব ছিল বাংলার নবাবের হাতে। যাবতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়ে গিয়েছিল নবাব নজম উদ-দৌলার উপর। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। ফলে নবাবের হাতে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব। ব্রিটিশ কোম্পানি পেয়েছিল দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা। বাংলার এই শাসন ব্যবস্থাকে *দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা* (Dual system of administration) বলা হয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বিদেশি শক্তি। সেই প্রথম কোনো বিদেশি বণিক কোম্পানির হাতে একটি সুবার দেওয়ানির অধিকার ন্যস্ত হয়েছিল। ক্রমে দেখা যায় নিজেদের বাণিজ্য চালানোর প্রয়োজনে ব্রিটিশ কোম্পানির ব্রিটেন থেকে মূলধন নিয়ে আসার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। বাংলার রাজস্বই কোম্পানির ব্যবসায় লগ্নি করা হয়। বস্তুত ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তার ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ভিত তৈরি হয়েছিল। 'বণিকের মানদণ্ড' ক্রমে 'রাজদণ্ডে' পরিণত হয়েছিল।

টুকরো কথা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় দ্বৈতশাসন চলেছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। এর ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বঙ্গাব্দের হিসাবে বছরটা ছিল ১১৭৬ বঙ্গাব্দ। তাই সাধারণভাবে ঐ দুর্ভিক্ষকে '৭৬-এর মন্বন্তর বলা হয়।

"ইংরেজেরা বাণিজ্যলোভে প্রজাসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন ; .... কিন্তু হায়। প্রজার রোদনে কেহই কর্ণপাত করিলেন না! জমীদারদল মান সম্ভ্রম এবং জমীদারী-রক্ষার জন্য ইংরেজের করুণাকটাক্ষের আশায়, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন;....।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে সকল কৃষকসন্তান আশা ও উৎসাহের সহিত গ্রাম্য সঙ্গীত গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হলকর্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিল, —উপযুক্ত বর্ষণাভাবে, সুসময়ে জলসেচ না পাইয়া, শীঘ্রই তাহাদের আশা ও উৎসাহ উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। হৈমন্তিক ধান্য নষ্ট হইয়া গেল, অগ্নিমূল্য সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে লাগিল।.... এক বৎসর নিরাশ হইয়া পর

বৎসরের ফসলের আশায় আবার কৃষককুল হলকর্ষণ করিল; কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৎসর চলিয়া গেল ; —১৭৬৯ খৃষ্টাব্দেও শস্যের আশা নির্ম্মূল হইল।

....

... যখন কালের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন.... ইংরাজ সেনার অন্ন সংস্থানের জন্য ছলে বলে কৌশলে যথাসাধ্য চাউল ধান গোলাজাত করিয়া, পুনরায় নিপুণহস্তে রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন!

....

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের সূচনা হইতেই চারি দিকে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল; — অন্নাভাবের সঙ্গে মহামারী মিলিত হইয়া গ্রাম নগর উৎ সন্ন করিতে আরম্ভ করিল! দেশময় মহামন্বন্তর জাগিয়া উঠিলে, এই সকল শ্বেতাঙ্গ সওদাগর-গোষ্ঠীর পক্ষে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার সহজ পথ আবিষ্কৃত হইল।.... দুর্ভিক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য কোনরূপ আয়োজন করা দূরে থাকুক, বরং দুর্ভিক্ষ যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহাই ইহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

....

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের নিদারুণ গ্রীষ্মকালে শত শত লোকে কালকবলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। কৃষকেরা গোমহিষাদি বিক্রয় করিল, কৃষিযন্ত্রাদি হস্তান্তরিত করিল, বীজধান্য পর্যন্তও দুর্ভিক্ষে দগ্ধ হইয়া গেল; —অবশেষে তাহারা পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু হায়! অল্পদিনের মধ্যেই ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইল!

....

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিলাতের ডিরেক্টারগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে:

যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও মন্বন্তরের গতিরোধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু যাঁহারা এরূপ বিপদের দিনেও পরপীড়ন করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম।....

হেস্টিংস আসিয়া যখন মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন.... তিনি লিখিলেন যে: এত বড় মহামন্বন্তরেও রাজস্বসংগ্রহে কিছুমাত্র শিথিলতা করা হয় নাই! এক-তৃতীয়াংশ কৃষক জীবন বিসর্জন করিয়াছে, কৃষিকার্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু তথাপি দুর্ভিক্ষশেষে পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে রাজকর সংগৃহীত হইতেছে! যে সকল কারণে সর্বনাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

[উদ্ধৃত অংশগুলি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'মন্বন্তর' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

দুর্ভিক্ষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা
(১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে)

কোম্পানি - শাসনের বিস্তার : ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা

> **নিজে করো**
> *৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্রটির মতো একটি মানচিত্র আঁকো। তাতে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার চিহ্নিত করো।*

ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলেই ব্রিটিশ কোম্পানি 'পরোক্ষ শাসন' চালাত। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি রাখত কোম্পানি। সেই প্রতিনিধিরা *রেসিডেন্ট* নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ব্যবস্থা একটি নতুন ব্যবস্থা ছিল। এর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ কোম্পানির চূড়ান্ত ক্ষমতা রূপ পেয়েছিল। কোম্পানির নজর এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ভারতীয় রাজশক্তিগুলির বিশেষ ছিল না। কোম্পানির হয়ে সেই নজরদারির কাজটাই চালাত স্থানীয় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানি বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দরাবাদের রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। তবে সেইসময়ে রেসিডেন্টরা নিজেদের কাজকর্ম বিষয়ে সংযত থাকতেন।

লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে রেসিডেন্টরা সাবধানতার বদলে আগ্রাসী নীতি নিয়েছিলেন। ওয়েলেসলির *অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি* এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক সময় রেসিডেন্টরা কোম্পানিকে সরাসরি এলাকা দখলের জন্য উসকে দিতে থাকে। তবে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসার পর সাময়িকভাবে রেসিডেন্সি ব্যবস্থার আগ্রাসন থমকে যায়। কিন্তু কর্নওয়ালিস মারা যাওয়ার পরে নতুন করে কোম্পানি এলাকা দখলের কাজে উদ্যোগী হয়।

লর্ড ওয়েলেসলি   লর্ড ডালহৌসি

পরোক্ষ শাসন কায়েমের বদলে বিভিন্ন এলাকাকে সরাসরি কোম্পানির অধীন এলাকা হিসেবে দখল করে নেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়। লর্ড ডালহৌসির *স্বত্ব বিলোপ নীতি* সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগ : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি

ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন বিস্তার প্রক্রিয়ায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি কখনও

স্বেচ্ছায় কখনও বা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে ঐ নীতি দুটির আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। একদিকে হায়দরাবাদের নিজাম স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান ঐ নীতির বিরোধিতা করার জন্য কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া মারাঠা, শিখ ও অন্যান্য বিভিন্ন রাজশক্তিগুলিও নানাভাবে ঐ আগ্রাসী নীতিদুটির মুখে পড়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের রাজশক্তিগুলির মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব চলত। প্রত্যেকেই নিজের শাসন এলাকা ও সম্পদ বাড়াবার উদ্যোগ নিত। ফলে পারস্পরিক সংঘাত ছিল অনিবার্য। ব্রিটিশ কোম্পানিকেও একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখত রাজশক্তিগুলি। ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে রাজশক্তিগুলির অনেকেই কোম্পানির সঙ্গে জোট বাঁধত। দেশীয় রাজশক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই ক্রমেই আঞ্চলিক রাজনীতির ব্যাপারে ব্রিটিশ কোম্পানি ভূমিকা নিতে শুরু করে। তাছাড়া রাজনৈতিক অশান্তি কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্যের পথেও বাধা ছিল। অতএব রাজ্যগুলির দলাদলির সুযোগে কোম্পানি সেগুলি দখল করার চেষ্টা করত।

ব্রিটিশ কোম্পানির আগ্রাসী নীতির অন্যতম রূপ ছিল অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি। লর্ড ওয়েলেসলি ঐ নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের আঞ্চলিক শক্তিগুলির বিবাদজনিত অশান্তিকে ওয়েলেসলি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপদ হিসেবে তুলে ধরতেন। তারপর সরাসরি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশীয় শক্তিগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য করতেন।

অষ্টাদশ শতকে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের নেতৃত্বে মহীশূর রাজ্য দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল। মহীশূরের সেনাবাহিনী ইউরোপীয় কায়দায় গড়ে তোলা হয়েছিল। মহীশূরের আঞ্চলিক বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে হায়দর ও টিপুর সংঘাত হয়েছিল। ঐ দ্বন্দ্বে ক্রমেই ব্রিটিশ কোম্পানি নাক গলাতে থাকে। ফলে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে মহীশূরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে উদ্যোগী হয় ব্রিটিশ কোম্পানি।

১৭৬৭ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারটি যুদ্ধ হয় কোম্পানি ও মহীশূরের মধ্যে। সেগুলিকে *ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ* বলা হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মাধ্যমে লর্ড ওয়েলেসলি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত করেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করতে গিয়ে টিপু সুলতান মারা যান। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করে মহীশূরের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। মহীশূর রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে সরাসরি কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা

টুকরো কথা
ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

ভারতে উপনিবেশ গড়ে তোলা আর বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ফরাসিদের স্বার্থের সংঘাত চলেছিল প্রায় ২০ বছর ধরে। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যের এই সংঘাত মূলত দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। করমণ্ডল উপকূল ও তার পশ্চাদভূমিকে ইউরোপীয়রা *কর্ণাটিক* নাম দিয়েছিল। এই অঞ্চলই ছিল তিনটি ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের মূল কেন্দ্র। ভারতে ফরাসিদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি। এই সময় পণ্ডিচেরির ফরাসি গভর্নর জেনারেল দুপ্লে স্থানীয় রাজা, নবাব ও অঞ্চল প্রধানদের সেনাবাহিনী ও সম্পদ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বন্দিবাসে (তৃতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধে) ফরাসিদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। এই পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা বিস্তারের পথে আর কোনো ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

জোসেফ দুপ্লে

হয়েছিল। কোম্পানির সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় মহীশূরে। হায়দরাবাদকে মহীশূরের কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হয়।

দাক্ষিণাত্যে তখন মারাঠা জোটের আধিপত্য বজায় ছিল। পেশোয়া পদের অধিকার নিয়ে মারাঠা জোটের মধ্যে বিবাদ বাধে। রঘুনাথ রাও পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করেন। তখন মারাঠা সর্দারেরা রঘুনাথ রাওয়ের বিরুদ্ধে একজোট হয়। রঘুনাথ রাও ব্রিটিশদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে ব্রিটিশ-বাহিনী রঘুনাথ রাওয়ের সাহায্যের জন্য যায়। ক্রমে মারাঠা জোটের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সংঘাত তৈরি হয়। যদিও ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে *সলবাইয়ের চুক্তিতে* কোম্পানির সঙ্গে মারাঠাদের সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়। কোম্পানি-বিরোধী শক্তিশালী জোট ভেঙে যায়।

পেশোয়া পদ নিয়ে অবশ্য মারাঠা সর্দারদের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। সেই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলি মারাঠা শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের উদ্যোগ নেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে বেসিনের সন্ধির মাধ্যমে অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়। পেশোয়ার দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বসানো হয়। কোম্পানির সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় বাজিরাও শাসন চালাতে থাকেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানির লড়াই অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও বিভিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীকে একজোট করে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৯ খ্রিস্টাব্দ) কোম্পানির মুখোমুখি হন। সেই যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানি পেশোয়ার সমস্ত এলাকার দখল নেয়। পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মারাঠা শক্তি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেয়। দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার চূড়ান্ত রূপ পায়।

উত্তর ভারতে অযোধ্যা ও পঞ্জাব কোম্পানির আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় কোম্পানির প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া কোম্পানির স্থায়ী সেনাবাহিনী অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয়েছিল। পাশাপাশি অযোধ্যার উত্তরাধিকারী নিয়ে গোলযোগ তৈরি হয়। সেইসব পরিস্থিতির সুযোগে অযোধ্যার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়।

টিপু সুলতানের পরাজয়। মূল ছবিটি হেনরি সিঙ্গলটন-এর আঁকা (আনু. ১৮০০খ্রিস্টাব্দ)

উত্তর ভারতে পঞ্জাবে শিখ শক্তির মোকাবিলা করাই কোম্পানির পক্ষে বাকি ছিল। শিখদের মধ্যেও উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব পাকিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে উত্তর ভারতের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে 'অশান্ত' পরিস্থিতিকে শান্ত করার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি পঞ্জাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখ-বাহিনী হেরে যায়। *লাহোরের চুক্তি* (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী জলন্ধর দোয়াবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। শিখ দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। ঐ নীতির প্রয়োগ কর্তা লর্ড ডালহৌসির আমলে (১৮৪৮-৫৬ খ্রিস্টাব্দ) কোম্পানির আগ্রাসী রূপ প্রকট হয়েছিল। যেসব ভারতীয় শাসকদের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকত না, তাদের শাসন এলাকা কোম্পানির হস্তগত হয়ে যেত। সেভাবেই ডালহৌসি সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন। কোম্পানির সেনাবাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য হায়দরাবাদের বেরার প্রদেশ ছিনিয়ে নেন ডালহৌসি। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অপশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার বাকি অংশ কোম্পানির দখলে নিয়ে আসেন তিনি। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে জেতার ফলে পঞ্জাবও ক্রমে কোম্পানির অধিকারে চলে যায়। এইভাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লর্ড ডালহৌসির নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশের ষাটভাগেরও বেশি অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

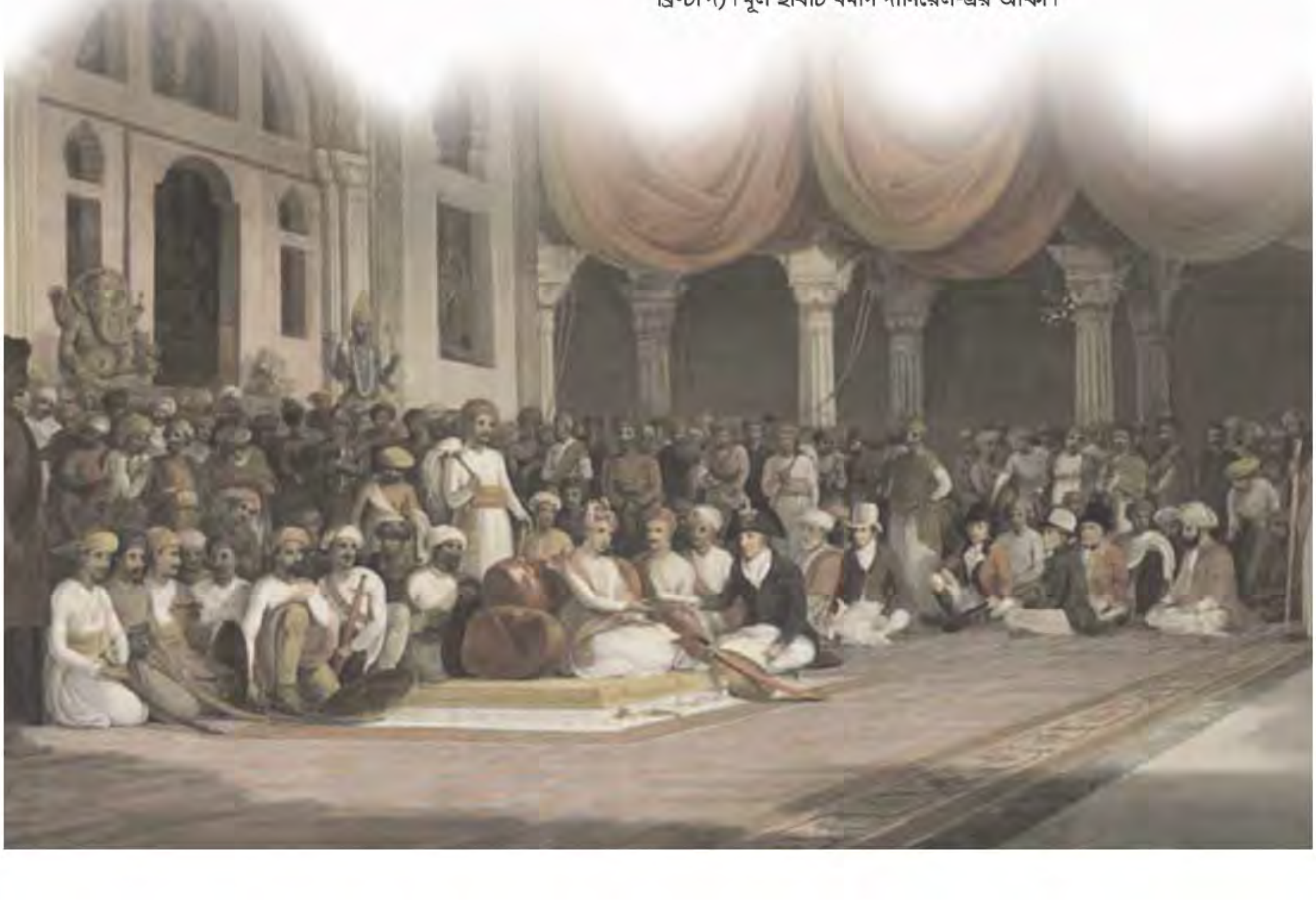

পেশোয়া-র দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও মারাঠা নেতৃত্বের চুক্তি (১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ)। মূল ছবিটি থমাস দানিয়েল-এর আঁকা।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি (আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
অযোধ্যা	প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	সাদাৎ খান
স্বত্ববিলোপ নীতি	বক্সারের যুদ্ধ
লাহোরের চুক্তি	মহীশূর
টিপু সুলতান	লর্ড ডালহৌসি

২। **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার— (দেওয়ান / ফৌজদার/নবাব)।

খ) আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন— (মারাঠা/ আফগান/ পারসিক)।

গ) আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল— (মির জাফর ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/মির কাশিম ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে)।

ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন— (সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম/সম্রাট ফাররুখশিয়র/ সম্রাট ঔরঙ্গজেব)।

ঙ) স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন— (টিপু সুলতান/সাদাৎ খান/নিজাম)।

৩। **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :**

ক) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কি ছিল?

খ) কে, কীভাবে ও কবে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

গ) 'পলাশির লুণ্ঠন' কাকে বলে?

ঘ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?

ঙ) ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের কাজ কী ছিল?

৪। **নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :**

ক) অষ্টাদশ শতকে ভারতে প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতাই কেবল দায়ী ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

খ) পলাশির যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোনটি ব্রিটিশ কোম্পানির ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) মির কাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার কী ভূমিকা ছিল? বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব কী হয়েছিল?

ঘ) ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি থেকে স্বত্ববিলোপ নীতিতে বির্বতনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

ঙ) মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দি খান-এর সময়ে বাংলার সঙ্গে মুঘল শাসনের সম্পর্কের চরিত্র কেমন ছিল?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো তুমি নবাব আলিবর্দি খান-এর আমলে বাংলার একজন সাধারণ মানুষ তোমার এলাকায় বর্গি আক্রমণ হয়েছিলো। তোমার ও তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে বর্গিহানার অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি কথোপকথন লেখো।

খ) ধরো তুমি ব্রিটিশ কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি। '৭৬-এর মন্বন্তর-এর সময় তুমি বাংলায় ঘুরলে তোমার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হবে? মন্বন্তরের সময়ে মানুষকে সাহায্যের জন্য কোম্পানিকে কী কী করতে পরামর্শ দেবে তুমি?

একটি গোরুর গাড়ি। মূল ছবিটি ব্যারন দ্য মঁতলেমবার-এর আঁকা (আনুমানিক ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ)। ছবিটি জেমস ফোর্বস-এর **Oriental Memoirs** বইয়ের প্রথম খণ্ডে (১৮১২ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রিত হয়েছিল।

৩ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদতে ছিল একটি বণিক সংস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্যের স্বার্থে তারা কতগুলি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। সেই ঘাঁটিগুলির মধ্যে ছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা। কালক্রমে এই তিনটি বাণিজ্যঘাঁটিকে কেন্দ্র করেই *ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা* তৈরি হয়েছিল। ১৬১১ ও ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে মসুলিপটনম ও সুরাটকে ঘাঁটি করে ব্রিটিশ কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। পরে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে একটি বাণিজ্যিক ঘাঁটি বানায় কোম্পানি। মাদ্রাজপটনম গ্রামে সেন্ট জর্জ দুর্গও বানায় ব্রিটিশ কোম্পানি। ক্রমে সেন্ট জর্জ ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় সেন্ট জর্জ দুর্গ প্রেসিডেন্সি বা *মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি*। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশ পড়েছিল। আজকের তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের পাশাপাশি, কর্ণাটক ও দক্ষিণ উড়িষ্যার বেশ কিছু অঞ্চলও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রেসিডেন্সির দুটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। গ্রীষ্মকালে ওটাকামুন্দ ও শীতকালে মাদ্রাজ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মূল গোড়াপত্তন হয়েছিল সুরাটে ব্রিটিশ কোম্পানির ঘাঁটি বানানোকে কেন্দ্র করে। ধীরে ধীরে পশ্চিম ও মধ্য ভারত এবং আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি মিলে *বোম্বাই প্রেসিডেন্সি* তৈরি হয়। সিন্ধু প্রদেশও এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। গোড়ার দিকে এই প্রেসিডেন্সিটি পশ্চিম প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত ছিল। তবে সুরাটের ক্রমে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অবনতি হতে থাকে। পাশাপাশি বোম্বাই উন্নত হতে থাকে। ফলে, ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাইকে ঘিরেই ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপ বিস্তৃত হতে থাকে।

কলকাতাকে ঘিরে পূর্বভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ দ্রুততর হয়েছিল। ধীরে ধীরে কলকাতাই হয়ে উঠেছিল ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার পায়, তখন থেকেই বাংলার উপর কোম্পানির কর্তৃত্ব গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নিজামতের অধিকার পায় ব্রিটিশ কোম্পানি। এইভাবে দেওয়ানি ও নিজামত— দুই অধিকার পেয়ে বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার চূড়ান্ত হয়। বাংলাতেও গড়ে ওঠে প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চল মিলে ছিল *বাংলা প্রেসিডেন্সি*। ধীরে ধীরে এই প্রেসিডেন্সিতে যুক্ত হয়েছিল আরও বহু অঞ্চল। পঞ্জাব, উত্তর ও মধ্য ভারতের অঞ্চলগুলি এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অঞ্চলও বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। মাদ্রাজের মতো কলকাতাতেও ব্রিটিশ কোম্পানি দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়ম) বানিয়েছিল। তাই বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রেসিডেন্সিও বলা হতো এক সময়ে।

গভর্নমেন্ট হাউস, কলকাতা। মূল ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (আনু. ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

এইভাবে তিনটি প্রেসিডেন্সিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ গড়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার ঘাঁটিগুলি তিনটি আলাদা পরিষদ বা Council-এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। লন্ডনে ব্রিটিশ কোম্পানির যে পরিচালকগোষ্ঠী বা Council of Directors ছিল, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলত তিনটি কাউন্সিল। কাউন্সিলের একজন সদস্যকে ঐ ঘাঁটির *গভর্নর* নির্বাচিত করা হতো।

উইলিয়ম পিট

কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির বণিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উপর ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রসঙ্গ ওঠে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সে বিষয়ে নানা আইন তৈরি করা হয়। সেই সব আইন মোতাবেক ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কাজ-কারবারের উপর সরাসরি ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। এই রকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের *রেগুলেটিং অ্যাক্ট* এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিট প্রণীত *ভারত শাসন আইন*।

টুকরো কথা

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিট প্রণীত ভারত শাসন আইন

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলা প্রেসিডেন্সি তিনটির স্বতন্ত্র কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। *গভর্নর জেনারেল* বলে নতুন একটি পদ তৈরি করা হয়। ঠিক করা হয় বাংলার গভর্নরই হবেন গভর্নর জেনারেল। তাঁর অধীনেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাণিজ্যিক ঘাঁটিগুলির গভর্নরেরা থাকবেন। গভর্নর জেনারেল পদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। চারজন সদস্য নিয়ে তৈরি হবে একটি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল। বস্তুত, এই আইনের ফলে কলকাতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রাজধানীতে পরিণত হয়।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট (যাঁকে William Pitt, the younger বলা হতো) নতুন একটি আইন বানান। সেই আইনকে পিট প্রণীত বা পিটের ভারত শাসন আইন বলা হয়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ঐ আইনটি বলবৎ হয়। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপের উপর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নজরদারি নিশ্চিত হয়েছিল।

পিট প্রণীত আইন মোতাবেক একটি *বোর্ড অফ কন্ট্রোল* তৈরি করা হয়। সেই বোর্ডকে কোম্পানির সামরিক ও অসামরিক শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ঐ আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, ভারতে কোম্পানির সমস্ত প্রশাসনিক কর্তাই গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব মেনে চলতে বাধ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতা দর্শন। মূল ছবিটি এস. ডেভিস-এর আঁকা (আনু. ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ)।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলেও গোড়ায় মুঘল ব্যবস্থাই ছিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের মাপকাঠি। তবে কোম্পানির অনেক কর্মচারী ঐ ব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম গরমিলের অভিযোগ তুলত।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দ্বৈত শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। সেই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কোম্পানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও নিশ্চিত সংগঠিত রূপ দেওয়ার পিছনে হেস্টিংসের ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই দেশীয় অভিজাতদের হাত থেকে বিচার ব্যবস্থাকে আলাদা করার প্রস্তাব ওঠে। পাশাপাশি ইউরোপীয়দের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে যে সুষ্ঠু বিচার সম্ভব তা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। ফলে বিচার ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ শুরু হয়। মনে করা হতো এর মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়রা ক্রমেই কোম্পানি-শাসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে নতুন বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রতি জেলাতে একটি দেওয়ানি ও একটি ফৌজদারি আদালত তৈরি করা হয়। তবে আইন-কানুনে মুঘল প্রভাব তখনও রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ানি আদালত গুলিতে প্রধান ছিলেন ইউরোপীয়রাই। পাশাপাশি দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করার কাজ করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলবীরা। ফৌজদারি আদালতগুলিতে একজন করে কাজি ও মুফতি থাকতেন। যদিও সেগুলির দেখভালের চূড়ান্ত দায়িত্ব ইউরোপীয়দের হাতেই ছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৭৩ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। তার পিছনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এলিজা ইম্পে। ঐসব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত ইউরোপীয়করণ করা হয়েছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বলা হয়েছিল বিচার বিভাগের সমস্ত আদেশ লিখে রাখতে হবে। সমস্ত দেওয়ানি আদালতগুলিকে একই নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

এলিজা ইম্পে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

টুকরো কথা

সুপ্রিম কোর্ট

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রি:) অনুযায়ী ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একটি ইম্পিরিয়াল কোর্ট তৈরি করা হয়। সেখানে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল যে, কেবল ভারতে থাকা ব্রিটিশ নাগরিকদেরই বিচার করবে এই কোর্ট। কিন্তু, ক্রমশই সেই কোর্টের নানান কার্যকলাপকে ঘিরে ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে কোর্টের বিরোধিতা তৈরি হয়। কোর্ট প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতো। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ইম্পিরিয়াল তথা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কোনোও মামলা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারে পড়বে না। তাছাড়া কোম্পানির গভর্নর ও গভর্নরের কাউন্সিলের কাজকর্মে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা চারের বদলে তিনজন করা হয়। ১৮০১ ও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও একটি করে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে, গোটা ভারত জুড়ে তিনটি সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়েছিল।

বিচারে সমতা আনার জন্য দরকার ছিল প্রচলিত আইনগুলির অভিন্ন ব্যাখ্যা। সেই উদ্দ্যেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১১ জন পন্ডিত হিন্দু আইনগুলির একটি সারসংকলন তৈরি করেন। ঐ সংকলনটির ইংরেজী অনুবাদ করা হয়। তার ফলে দেশীয় আইনের ব্যাখ্যার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের ভারতীয় সহকারীদের উপরে বিশেষ নির্ভর করতে হতো না। মুসলমান আইনগুলিরও একটি সংকলন বানানো হয়। এসবের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস আইনগুলিকে সংহত করে *কোড* বা বিধিবদ্ধ আইন চালু করেন। তার ফলে দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব আলাদা করা হয়। জেলা থেকে সদর পর্যন্ত আদালত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের অধিকার স্বীকার করা হয়। তবে সমস্ত আদালতেই প্রধান বিচারপতি হতেন ইউরোপীয়রাই। লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচার ব্যবস্থার সংস্কার বাস্তবে ঔপনিবেশিক বিচার কাঠামো থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দিয়েছিল।

মুঘল আমলে বিচার ব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ আমলের বিচার ব্যবস্থার বদলগুলি সাধারণ ভারতীয়রা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। বিচার কাঠামোকে সংহত করার মাধ্যমে সেগুলি হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

লর্ড কর্নওয়ালিস

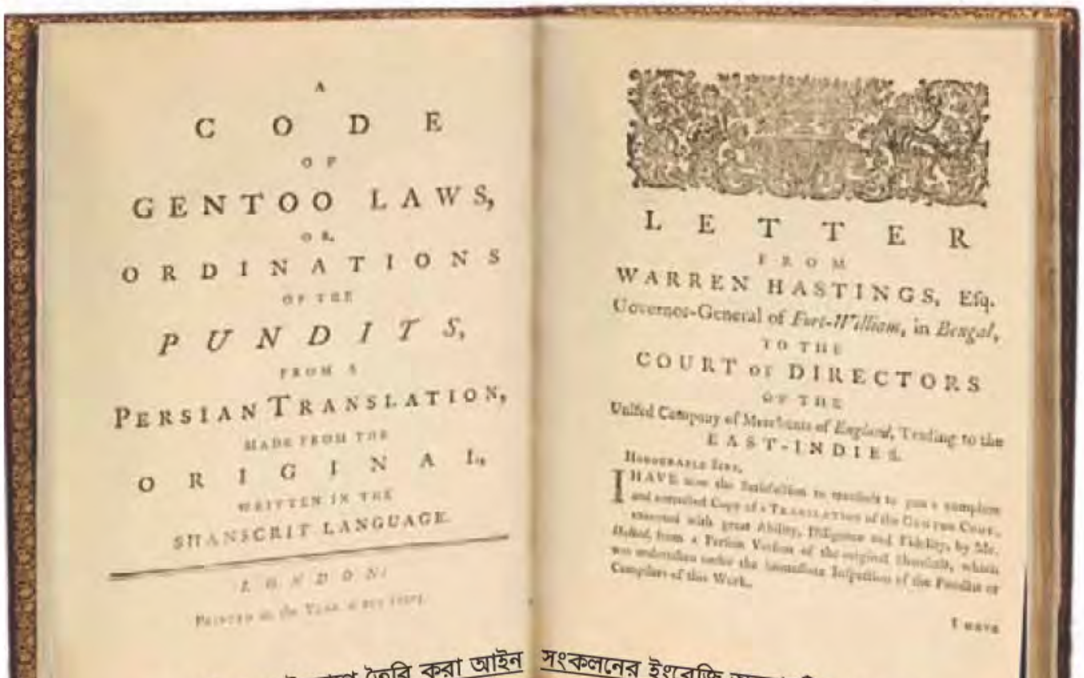
A
CODE
OF
GENTOO LAWS,
OR,
ORDINATIONS
OF THE
PUNDITS,
FROM A
PERSIAN TRANSLATION,
MADE FROM THE
ORIGINAL,
WRITTEN IN THE
SHANSCRIT LANGUAGE.
LONDON:

LETTER
FROM
WARREN HASTINGS, Esq.
Governor-General of Fort-William, in Bengal,
TO THE
COURT OF DIRECTORS
OF THE
United Company of Merchants of England, Trading to the
EAST-INDIES.

ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে তৈরি করা আইন সংকলনের ইংরেজি অনুবাদটির প্রথম দুটি পৃষ্ঠা।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

টুকরো কথা

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সংস্কার

গভর্নর জেনারেল হিসাবে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক চেয়েছিলেন প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে। পাশাপাশি ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়টিকেও বেন্টিঙ্ক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ ও বারাণসী অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর সময়েই উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐসব অঞ্চলে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন বেন্টিঙ্ক।

বেন্টিঙ্কের সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদে আবার ভারতীয়দের নিয়োগ করা শুরু হয়। বেন্টিঙ্কের আমলে তৈরি হওয়া আইনে বলা হয়, কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মাপকাঠির বদলে কেবল যোগ্যতা বিচার করবে। উঁচুপদে নিয়োগ করলেও ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন কম দেওয়া হতো। উত্তর ও মধ্য ভারতে সক্রিয় ঠগি দস্যুদের দমন করার জন্যেও কর্নেল স্লিম্যানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করেন বেন্টিঙ্ক। দ্রুতই স্লিম্যান ঠগি দস্যুদের দমন করেছিলেন।

ঠগিদের একটি দল। ছবিটিতে ঠগিরা কীভাবে পথিকের সর্বস্ব লুঠ করে তাকে হত্যা করত, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকরণ

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট প্রণীত আইনের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের উপর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছিল। ফলে, ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ ব্রিটিশ-স্বার্থে পরিচালিত করার উদ্যোগ জোরদার হয়। পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন যত বাড়ল ততই তাকে চালানোর জন্য সম্পদের দরকার হলো। ফলে শাসন চালানোর ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হলো দক্ষ শাসন যন্ত্রের। গোটা দেশে কোম্পানি-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে একইরকম শাসন চালু করা হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় শাসকের মতো করে শাসন চালাতো। ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। সুষ্ঠু শাসনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজানো দরকার হয়ে পড়েছিল। বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি পুলিশ ও সেনা ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র বাস্তবগ্রাহ্য রূপ পেয়েছিল।

পুলিশ ব্যবস্থা

মুঘল পুলিশ ব্যবস্থায় ফৌজদার, কোতয়াল, চৌকিদারদের ক্ষমতা ছিল বেশি। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি লাভ করে তখনও এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মন্বন্তরের ফলে সামাজিক 'আইন শৃঙ্খলার অবনতি' দেখা দেয়। সেই ক্ষেত্রে মুঘল আমলে পুলিশি ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী ছিল না। তাই পুলিশ ব্যবস্থাকেও ইউরোপীয় তদারকির অধীনে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণ ক্রমশ বাড়তে থাকা 'আইন শৃঙ্খলার অবনতি' ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরোনো ফৌজদারি ব্যবস্থা চললেও শেষ পর্যন্ত ফৌজদারদের জায়গায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের বসানো হয়।

বাংলা প্রেসিডেন্সির পুলিশ বাহিনী। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ ছাপা (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জেলাগুলির দেখভাল করার জন্য পুলিশ থানা ব্যবস্থা চালু করেন। প্রতিটি থানার দায়িত্ব পায় দারোগা। তাদের নিয়ন্ত্রণ করত

ম্যাজিস্ট্রেটরা। স্থানীয় অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে দারোগারাই ছিল কোম্পানি-শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক।

কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে দারোগারা সমঝোতা করে চলত। ফলে সাধারণ মানুষের উপর চলত জমিদার ও দারোগার যৌথ পীড়ন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে দারোগা ব্যবস্থার বিলোপ করা হয়। তার বদলে গ্রামের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় কালেক্টরকে। ফলে আবারও রাজস্ব আদায় ও আরক্ষার দায়িত্ব একজনের হাতেই চলে যায়। রাজস্ব আদায় ও পুলিশি দমন পীড়ন চালাতে থাকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরাই। কিন্তু এরকম আপাত সংস্কারের মধ্যে দিয়ে পুলিশি ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তোলা যায়নি।

ব্রিটিশ কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যে পুলিশ ব্যবস্থার নানারকম সংস্কার করা হতে থাকে। শেষপর্যন্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশ অঞ্চলে নতুন ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ক্রমে আলাদা পুলিশ আইন বানানো হয়। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল পুলিশি ব্যবস্থা।

সেনাবাহিনী

প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের যেকোনো বিরোধিতার মোকাবিলা করত পুলিশ বাহিনী। তবে পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠলে প্রয়োজন পড়ত সেনাবাহিনীর। ফলে ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে বেড়ে উঠেছিল কোম্পানির সেনাবাহিনী। গোড়া থেকেই স্থায়ী সেনাবাহিনী তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল কোম্পানি। সেক্ষেত্রে মুঘল সেনা নিয়োগের পরম্পরা অনুসরণ করেছিল ব্রিটিশরা। উত্তর ভারতে কৃষকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। এমনকি সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে রাখা হতো। সেই প্রথা মেনেই কোম্পানিও নিজের ভারতীয় সেনা বা *সিপাহিবাহিনী* তৈরি করেছিল।

সেনাবাহিনীতে সিপাহি নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সামরিক খাতে ঔপনিবেশিক শাসক সবথেকে বেশি খরচ করত। কোম্পানির হয়ে এলাকা দখল করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্রোহের মোকাবিলা করাও সিপাহিদের কাজ ছিল।

বাংলা প্রেসিডেন্সির সেনাবাহিনী। আনুমানিক ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তোলা ফটোগ্রাফ।

ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে সেনাবাহিনীতে প্রচলিত জাতভিত্তিক ধারণাগুলির বিরোধিতা করেনি ব্রিটিশ কোম্পানি। ফলে সিপাহিবাহিনীতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকরা সহজেই জায়গা করে নিত। এইসব লোকেরা সিপাহিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ও নিয়মিত বেতন পেত। ফলে সিপাহিবাহিনীতে জাতভিত্তিক মনোভাব দেখা যেতে থাকে।

১৮২০-র দশক থেকে সিপাহিবাহিনীর কাঠামোয় বেশ কিছু বদল দেখা দিতে থাকে। মারাঠা, মহীশূর অঞ্চলের পাহাড়ি উপজাতি ও নেপালি গুর্খাদের সিপাহিবাহিনীতে নিয়োগ করা শুরু হয়। ফলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা কমতে থাকে। তার জন্য সিপাহিবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সিপাহিবাহিনী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ১৮৮০-র দশকে ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে প্রায় ২,৫০,০০০ সিপাহি ছিল। যাদের পিছনে মোট রাজস্বের ৪০ শতাংশ ব্যয় করা হতো।

আমলাতন্ত্র

অসামরিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রধান হাতিয়ার ছিল আমলাতন্ত্র। তবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের স্বাধীনতা ছিল না। ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতিগুলি প্রয়োগ করাই ছিল আমলাদের কাজ। ফলে একটি সংগঠিত আমলাতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল।

কোম্পানি-প্রশাসনের অধীনে আমলাতন্ত্রকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস *সিভিল সার্ভিস* বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ভারতের ব্রিটিশ প্রাশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কর্নওয়ালিসের। তাঁর ধারণা ছিল, উপযুক্ত বেতন না পাওয়ার ফলেই কোম্পানির কর্মচারীরা সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে না। ফলে কর্নওয়ালিস আইন জারি করে কোম্পানি-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও কোনো রকম উপহার নেওয়া বন্ধ করে দেন। তার পাশাপাশি চাকরির মেয়াদের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভেন্টদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করেন কর্নওয়ালিস। অবশ্যই প্রশাসনের কর্মচারীদের বেতনও বাড়িয়ে দেন তিনি।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকেই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করা বন্ধ হয়। লর্ড ওয়েলেসলি ইউরোপীয় প্রশাসকদের ভালোমত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেজন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিভিল সার্ভেন্ট বা অসামরিক প্রশাসকেরা ঐ কলেজে শিক্ষা পেতেন। তবে ব্রিটেনে কোম্পানির পরিচালকরা কলকাতায় প্রশিক্ষণের বদলে ব্রিটেনে প্রশিক্ষণকেই উপযুক্ত বলে মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত হেইলবেরি কলেজে

টুকরো কথা
সামরিক জাতি

ব্রিটিশ শাসকের ধারণা ছিল যেসব ভারতীয় ভাত খায় তারা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। রুটি খাওয়া ভারতীয়রা নাকি শারীরিকভাবে বেশি সক্ষম। ফলে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের তারতম্যের বিচার করা হতো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের পর সিপাহিবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। তখন থেকেই পঞ্জাবের জাঠ অধিবাসীদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি পাঠান, উত্তর ভারতের রাজপুত ও নেপালি গুর্খাদের সংখ্যাও সেনাবাহিনীতে বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা বলত এই সব সেনারা যুদ্ধে অনেক বেশি দক্ষ। এদেরকে *'সামরিক জাতি'* বলে প্রচার করা হতো। এর বদলে এই সিপাহিরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঔপনিবেশিক সেনার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই ছিল তথাকথিত সামরিক জাতির লোক।

প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সমস্ত প্রার্থীদেরকেই হেইলবেরি কলেজে যোগ দিতে হতো। একই কলেজে পড়ার ফলে সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি সিভিল সার্ভেন্টরা নিজেদের একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে ভাবতে শুরু করে। ঐ ঐক্যবোধ ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী ভাবনা অবশ্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা। মূল ছবিটির শিরোনাম *Our Judge*। ছবিটি জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিনসন-এর আঁকা।

টুকরো কথা

আইনের শাসন ও আইনের চোখে সমতা

ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতে *আইনের শাসন*-এর ধারণা চালু করেছিল। সেই ধারণা অনুযায়ী বলা হতো আদর্শগতভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন আইন মেনে কাজ করবে। আইনে শাসক ও শাসিতের সমস্ত অধিকারগুলি স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা থাকবে। শাসকের খামখেয়ালি ইচ্ছার উপরে শাসনপ্রণালী নির্ভর করবে না। এককথায় আইনের শাসন-এর ধারণায় খানিকটা গণতান্ত্রিক প্রশাসনের কথা বলা হয়েছিল।

কার্যত অবশ্য আদালতের দেওয়া আইনের ব্যাখ্যা মোতাবেক ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাজ করত। সেই ব্যাখ্যাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই শাসকের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো। ফলে আইনের শাসনের আদর্শের মধ্যে নিহিত গণতান্ত্রিক প্রশাসনও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আইনের শাসনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আইনের চোখে সমতার ধারণা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে একই আইন চালু করার কথা বলা হয়েছিল। অবশ্য সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমও ছিল। ইউরোপীয় ব্যক্তিদের বিচারের জন্য আলাদা আইন ও আদালত ছিল। তাছাড়া বাস্তবে আইন-আদালতকেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

মুদ্রিত বাংলা বই

ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠ-পোষণায় একটি হিন্দু আইন সংকলন করা হয়। সেটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন নাথানিয়েল ব্র্যাসি হালেদ। ইংরেজি অনুবাদটির সংক্ষিপ্ত নাম *A Code of Gentoo Law*। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালেদ একটি বাংলা ব্যাকরণও লিখেছিলেন। তার নাম *A Grammar of the Bengal Language*। ব্যাকরণ বইটি হুগলির জন অ্যান্ড্রুজ-এর ছাপাখানায় ছাপা হয়। ঐ বই ছাপার ক্ষেত্রেই প্রথম বিচল বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে, বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই জোনাথন ডানকান-এর অনুবাদ করা একটি আইনের বই। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেটির নাম *মপসল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলা হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম*।

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.
PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
MDCCLXXVIII.

নতুন শিক্ষা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থরক্ষার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফারসি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা জানা লোকেদের তিনি রাজস্ব দফতরের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের সুবিধার জন্য হিন্দু ও মুসলিম আইনগুলিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করানোর উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন হেস্টিংস। অন্য দিকে কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মনীতিগুলিকেও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করানো হয়েছিল। যেমন, এলিজা ইম্পে যে আইনগুলি বানিয়েছিলেন সেগুলির ফারসি ও বাংলা অনুবাদ করানো হয়। জোনাথন ডানকান ঐ আইনগুলির বাংলা অনুবাদ করেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বাস্তবে হেস্টিংস জানতেন ঔপনিবেশিক সমাজের জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচয় প্রশাসনের কাজে লাগে।

ওয়ারেন হেস্টিংস বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিতদের কলকাতায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। জোনাথন ডানকান ছাড়াও, চার্লস উইলকিনস ও নাথানিয়েল ব্র্যাসি হালেদ হেস্টিংসের উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে জোনাথন ডানকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু কলেজ। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সুগঠিত করার কাজে সহায়তা করবেন। বস্তুত, তার দশ বছর আগে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে খানিকটা একই উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আরবি ও ফারসি ভাষাচর্চার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উইলিয়ম জোনস ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলত সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলি আধুনিক ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করাই ছিল জোনসের লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন এই চর্চার ফলে ভারতের শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বোঝাপড়া অনেক সুষম হবে। সেই সুষম বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন আরও সুগম হয়ে উঠবে বলে জোনস মনে করতেন।

উইলিয়ম জোনস

এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন সদস্য এবং শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতেন। তার পাশাপাশি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন স্থানীয় পণ্ডিতদেরও ঐ কলেজে নিয়োগ করা হয়।

উইলিয়ম কেরি

টুকরো কথা

উইলিয়ম কেরি ও ব্যাপটিস্ট মিশন

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাশাপাশি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপন করা হয়েছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ব্রিটিশ কোম্পানির তরফে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন উদ্যোগে সামিল হন। নিজেদের মুদ্রণযন্ত্র বসিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন লেখা ছাপাতে শুরু করেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উইলিয়ম কেরি। তিনি ভারতীয় মহাকাব্যগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া বাইবেলের একটি অংশকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কেরি। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালেদের লেখা বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক বইটিকেও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন কেরি।

ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা, কলকাতা।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ মিশনারি সোসাইটির সদস্য আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় এসে অনেকগুলি মিশনারি স্কুল তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হেম্যান হোরাস উইলসন-এর নেতৃত্বে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়। ঐ কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রশাসন জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন তৈরি করেন। ঐ কমিটি ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ তৈরি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং ডেভিড হেয়ার ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাশাপাশি কলকাতা শহরের শিক্ষিত ও ধনী বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গও হিন্দু কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও হিন্দু কলেজের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন।

নিজে করো

তুমি যে স্কুলে পড়ো, সেই স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুঁজে দেখো। সে বিষয়ে একটি চার্ট বানাও তোমার স্কুলের ছবিসহ।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজি ভাষা-নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে সরাসরি বলা হয় যে, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে প্রশাসন বেশি জোর দেবে। তবে তার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও বছরে সরকারি অনুদান বরাদ্দ করা হবে। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় ভাষাতেও পড়াশোনা করার অধিকার শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। তবে, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে আবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়। ইংরেজি ভাষা-কেন্দ্রিক শিক্ষাচর্চা-নীতির পিছনে লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

টুকরো কথা

মেকলের প্রতিবেদন

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন বা মিনিটস পেশ করেন। সেই প্রতিবেদনে মেকলে বলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা জন্মগত ভাবে ভারতীয় হলেও; রুচি, আদর্শ ও নৈতিক আচরণের দিক থেকে হবে ব্রিটিশ— এমনটাই আশা করেছিলেন মেকলে। তাঁর প্রতিবেদনে মেকলে জানিয়েছিলেন, যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার চর্চা করবে তারা কোনও সরকারি অনুদান পাবে না। মেকলেও সংস্কৃত কলেজের বিলুপ্তির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বাস্তবে মেকলের ধারণা ছিল, ব্রিটিশরাই জাতিগতভাবে উন্নত এবং তাদের হাত ধরেই উপনিবেশ হিসেবে ভারতে আধুনিকতা আসবে। সে কারণেই তাঁর প্রতিবেদনে মেকলে ভারতের প্রচলিত জ্ঞানচর্চাকে হেয় করেছিলেন।

উনবিংশ শতকের চারের ও পাঁচের দশকে ক্রমেই সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তার হতে থাকে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় *কাউন্সিল অভ এডুকেশন* তৈরি হয়। ক্রমেই কাউন্সিল-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ও তার ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলে। পাশাপাশি শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছিল। তবে, সেই ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।

টুকরো কথা

উডের প্রতিবেদন

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বোর্ড অভ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের নেতৃত্বে শিক্ষাসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। তাকে উডের প্রতিবেদন বা *উড'স ডেসপ্যাচ* বলাহয়। সেই ডেসপ্যাচে সরকারকে প্রাথমিক থেকে বিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত একটি সুগঠিত শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও ভারতীয়— দু-ধরনের ভাষা চর্চার কথা বলা হয়েছিল। সেই মোতাবেক ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনটি প্রেসিডেন্সিতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছিল। উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যাও আগের থেকে বাড়ানো হয়। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গোড়া থেকেই অবশ্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় জোর পড়েছিল। সেখানের ব্রিটিশ প্রশাসকেরা মনে করতেন কেবল বোম্বাই শহরের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনার দাবি তৈরি হয়েছে। ফলে, বোম্বাই শহরের বাইরে অন্যান্য জায়গায় দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষাচর্চা হওয়া উচিত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অনেক স্কুলেই মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার ব্যবস্থা ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে গৃহীত শিক্ষাবিস্তার নীতির কতগুলি জরুরি দিক ছিল। ওই শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়া। বাস্তবে সার্বিক গণশিক্ষার কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে শিক্ষাবিস্তারের গণমুখী চরিত্র তৈরি হয়নি। পাশাপাশি উপযুক্ত প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ বা হাতেকলমে শেখার ব্যবস্থা যথেষ্ট না থাকায় কেবল পুঁথিগত চর্চার উপরেই শিক্ষার বিস্তার নির্ভর করেছিল। তা ছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বিচার সমর্থনের ফলে ভারতীয় প্রচলিত শিক্ষার চর্চা ক্রমে অবলুপ্তির মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমদিকে নারীশিক্ষার বিষয়টিকেও অবহেলা করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতিতে। ব্যক্তিগত কয়েকজনের উদ্যোগে নারীশিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল বীটন সাহেব (বেথুন)-এর উদ্যোগে তৈরি হওয়া বেথুন স্কুল।

বীটন (বেথুন) স্কুল প্রতিষ্ঠা

জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ণয়

জেমস রেনেল-এর হিন্দুস্তান-এর মানচিত্র-সংকলনের আখ্যাপত্র। ছবিটিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁদের পুঁথিপত্র তুলে দিচ্ছেন ব্রিটানিয়া-র হাতে। ব্রিটানিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার প্রতীক। অর্থাৎ ছবিটি যেন বলতে চাইছে যে, ব্রিটানিয়াই ক্রমে হয়ে উঠবেন ভারতের অতীত-সংস্কৃতির রক্ষক।

ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। তার মধ্যে জমি জরিপ করা ও তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ণয় করার প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার নতুন নবাব মির জাফরের থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনার জমিদারি পায়। তখন রবার্ট ক্লাইভ নতুন জমিদারি মাপজোকের জন্য একদল জরিপবিদের খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড নতুন ২৪ পরগনার জমি জরিপের কাজ শুরু করেন। তবে কাজ শেষ হওয়ার আগেই ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড মারা যান। তাঁর কাজ শেষ করেন হগ্ ক্যামেরন।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নদীপথগুলি জরিপ করেন জেমস রেনেল। তাঁকেই ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতের *সার্ভেয়ার জেনারেল* বা জরিপ বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করে। বাংলার নদীপথগুলি জরিপ করে রেনেল মোট ১৬টি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেই প্রথম সেই আমলের বাংলার নদী-গতিপথের মানচিত্র বানানো হলো।

বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রি:) পর ও দেওয়ানির অধিকার পাওয়ার ফলে ক্রমেই বাংলার জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ণয় বিষয় কোম্পানি তৎপর হয়ে ওঠে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে *কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অভ রেভেনিউ* নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া আরো একটা আলাদা রেভেনিউ বোর্ড তৈরি করা হলো। তার নাম *কমিটি অভ রেভেনিউ*। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কমিটি অভ রেভেনিউকে নতুন করে সাজিয়ে তার নাম দেওয়া হয় *বোর্ড অভ রেভেনিউ*। সেই থেকে ঐ নতুন বোর্ড অফ রেভেনিউই রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতে থাকে।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলের জলাশয়, রাস্তা ও জনবসতির একটি মানচিত্র বানাও।

টুকরো কথা

ইজারাদারি ব্যবস্থা

ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলা প্রেসিডেন্সির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত নিয়ে নানা পরীক্ষা করতে শুরু করে। প্রথমে জমির নিলামে সবচেয়ে বেশি ডাক দেওয়া ব্যক্তিকে জমি দেওয়া হতো। পরে প্রতি এক বছর করে একজন ব্যক্তির সঙ্গে কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস নদিয়া জেলায় একটি নতুন ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত চালু করেন। সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি জমির নিলামে সবথেকে বেশি খাজনা দেওয়ার ডাক দেবে তার সঙ্গে কোম্পানি ঐ জমির বন্দোবস্ত করবে। পাঁচ বছরের জন্য ঐ জমি ঐ ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হতো বলে ঐ বন্দোবস্তকে *ইজারাদারি বন্দোবস্ত* বলা হতো। তার পাশাপাশি ইজারার মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য ছিল বলে তাকে *পাঁচসালা বন্দোবস্ত* বলা হতো।

তবে দ্রুতই ইজারাদারি বন্দোবস্তের বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অনেক ইজারাদারই গ্রাম সমাজের বাইরের লোক হওয়ার জন্য ঠিকমতো রাজস্ব নির্ণয় করতে পারেননি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ধার্য রাজস্ব বাস্তব রাজস্ব আদায়ের থেকে বেশি হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় ইজারাদারদের অনেকেই দেয় রাজস্ব শোধ করতে ব্যর্থ হয়। তাই ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি *দশসালা বন্দোবস্ত* চালু করে। কিন্তু ক্রমে এসব বন্দোবস্ত তুলে দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চালু করেন *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত* (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। তার ফলে বাংলার ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়। পাশাপাশি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও জরিপ ও ভূমি-রাজস্ব নির্ণয় বিষয়ক কার্যকলাপ চলেছিল।

জেমস রেনেল-এর বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও আগ্রা-দিল্লির মানচিত্র-সংকলনের আখ্যাপত্র।

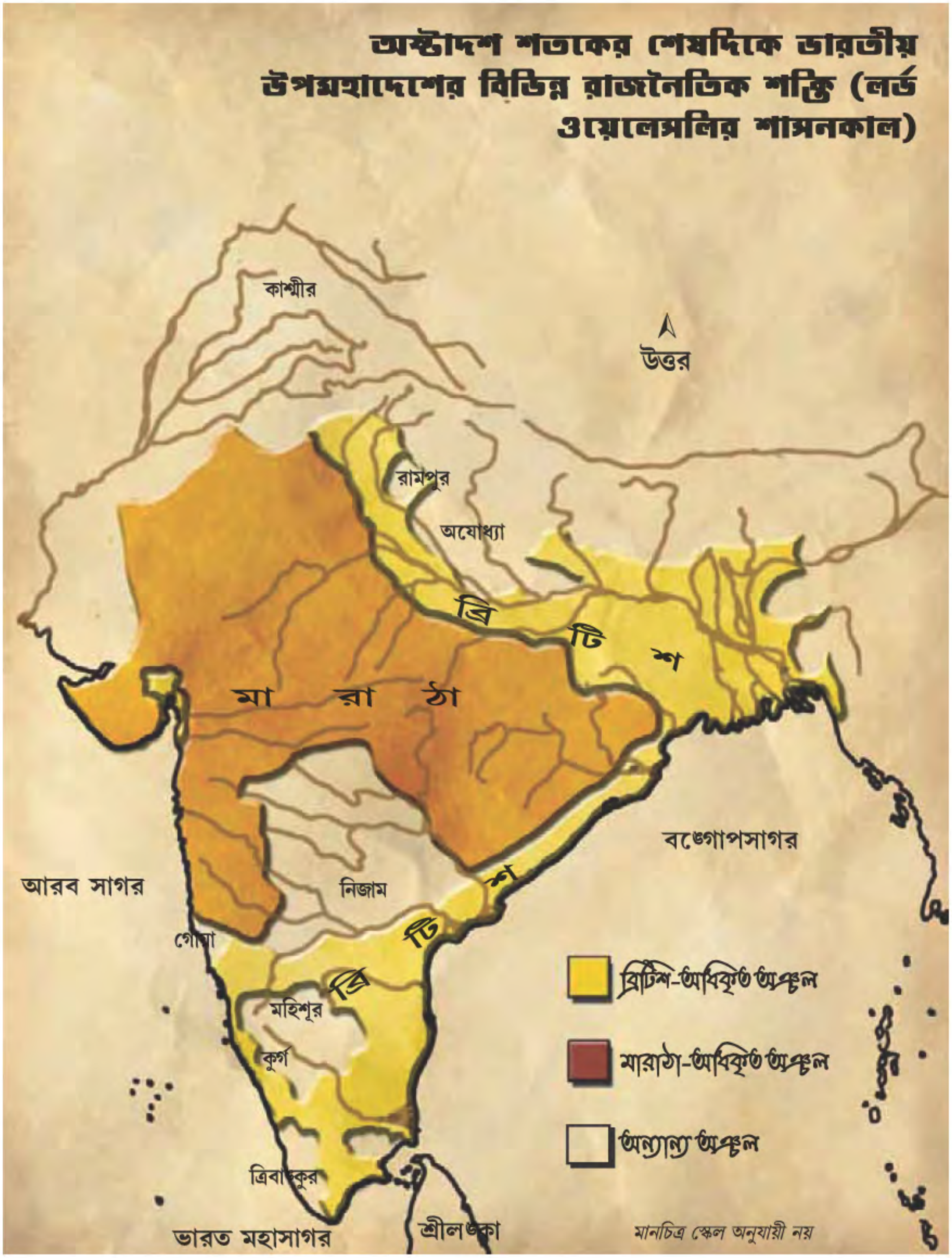
অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি (লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল)
কাশ্মীর
উত্তর
রামপুর
অযোধ্যা
ব্রি টি শ
মা রা ঠা
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
নিজাম
শ
টি
ব্রি
গোয়া
মহিশূর
কুর্গ
ত্রিবাঙ্কুর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল
মারাঠা-অধিকৃত অঞ্চল
অন্যান্য অঞ্চল
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল (লর্ড ডালহৌসির শাসনকালের শেষদিক)

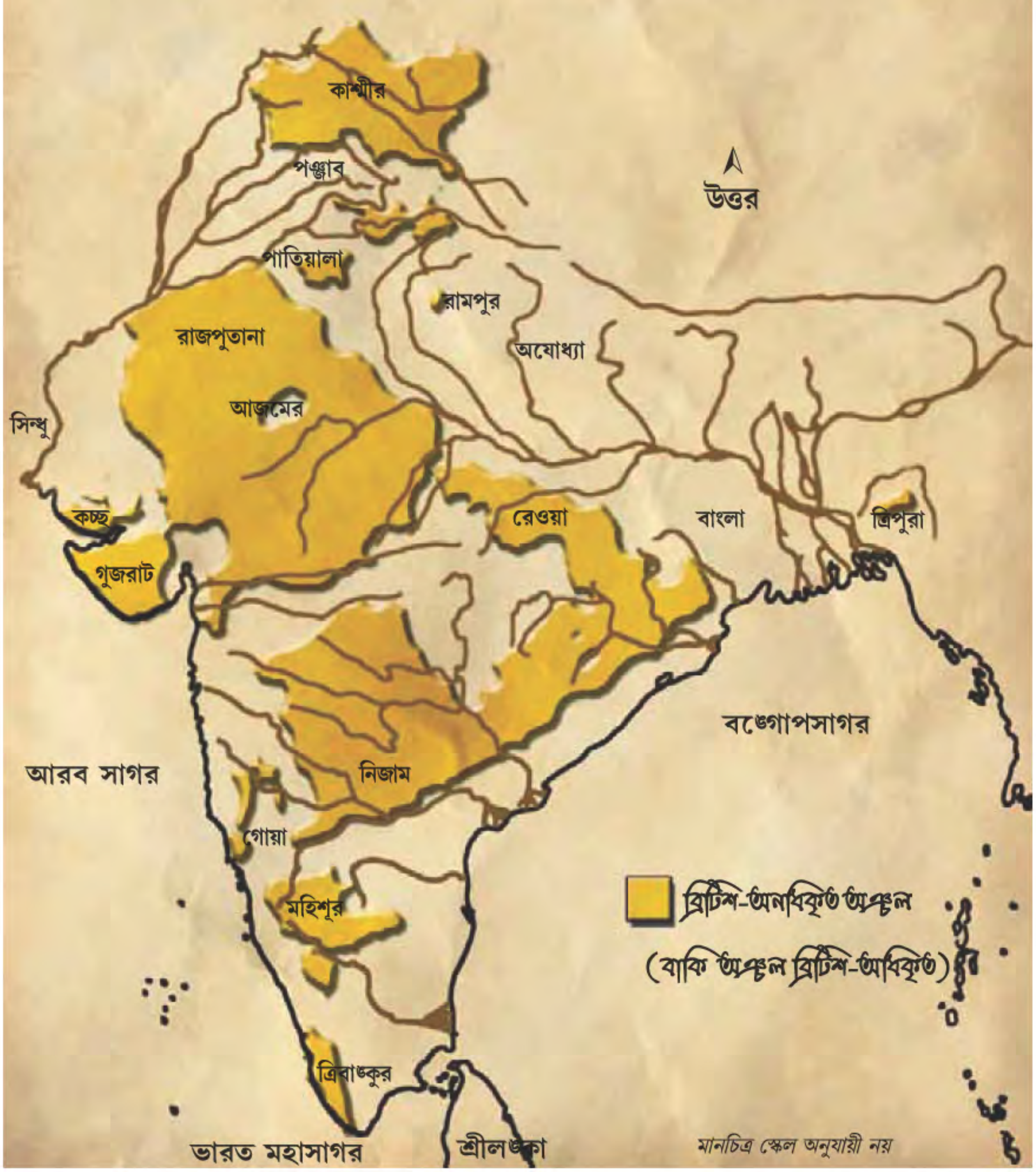

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :

ক) বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, বাংলা

খ) ক্লাইভ, হেস্টিংস, দুপ্লে, কর্নওয়ালিস

গ) বাংলা, বিহার, সিন্ধু প্রদেশ, উড়িষ্যা

ঘ) ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম কেরি , জোনাথন ডানকান, উইলিয়ম পিট

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) বাংলা প্রেসিডেন্সিকে সেন্ট জর্জ দুর্গ প্রেসিডেন্সি বলা হতো।

খ) বেনারসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জোনাথন ডানকান।

গ) উইলিয়ম কেরি ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি সোসাইটির সদস্য।

ঘ) দশ বছরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য কোম্পানি ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করেছিল।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা কাকে বলে?

খ) কোম্পানি-পরিচালিত আইন ব্যবস্থাকে সংহত করার ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিস কী ভূমিকা নিয়েছিলেন?

গ) কোম্পানির সিপাহিবাহিনী বলতে কী বোঝো?

ঘ) কোম্পানি-শাসনে জরিপের ক্ষেত্রে জেমস রেনেল-এর কী ভূমিকা ছিল?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা করো। ঐ সংস্কারগুলির প্রভাব ভারতীয়দের উপর কীভাবে পড়েছিল?

খ) ভারতে কোম্পানি-শাসনের বিস্তার ও সেনা বাহিনীর বৃদ্ধির মধ্যে কী সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) ব্রিটিশ কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কী ছিল? কীভাবে আমলারা একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো।

ঘ) কোম্পানি-শাসনের শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে বোম্বাইয়ের কোনো তফাৎ ছিল কী? কোম্পানির শিক্ষানীতির প্রভাব ভারতীয় সমাজে কীভাবে পড়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) কোম্পানি-শাসনের সঙ্গে জমি জরিপের সম্পর্ক কী ছিল? ইজারাদারি বন্দোবস্ত চালু করা ও তা তুলে দেওয়ার পিছনে কী কী কারণ ছিল?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো তুমি কোম্পানির একজন সিপাহি। তোমার কাজ ও কাজের পরিবেশ বিষয়ে জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

খ) ধরো তুমি ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার বাসিন্দা। হিন্দু কলেজ ও বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতার দু-জন শিক্ষিত ভারতীয়র মধ্যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি কথোপকথন লেখো।

৪ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র

১৭৬৯-’৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। তার ফলে কোম্পানি নিজের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। বাংলায় কোম্পানির নতুন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু তার ফলেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। বেশিবেশি রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের ঘাড়ে খাজনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে কৃষক সমাজে চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনকে নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

খাজনা আদায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর গলদগুলো লর্ড কর্নওয়ালিস দ্রুতই বুঝতে পেরেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের মূল পদ্ধতির ফলে কৃষক সমাজ ও দেশীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার ফলে কোম্পানিও যথেষ্ট লাভ করতে পারছিল না। কৃষির সংকটের ফলে কোম্পানির রেশম ও কার্পাস রফতানিতেও ভাটা পড়েছিল। দেশীয় হস্তশিল্প উদ্যোগের উপরেও কৃষি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এই সমস্ত সমস্যার মূলে ছিল রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বন্দোবস্ত। তাই কোম্পানির অনেক আধিকারিক খাজনা আদায় ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার কথা বলেছিলেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত* চালু করা হয়। মনে করা হয়েছিল যে, এর ফলে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসেবে গরমিল হবে না। জমিদারিগুলি থেকে কোম্পানির কত রাজস্ব প্রাপ্য তার হিসাব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো খাজনা আদায় করতে পারত না।

শস্য ঝাড়াইয়ে রত কৃষক। মূল ছবিটি সোমনাথ হোড়-এর আঁকা।

কোম্পানি আশা করেছিল জমিদারেরা নিজেদের লাভের হার বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যই জমিতে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করবে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির রাজস্ব উঁচু হারে হিসেব করা হয়েছিল।

রাজস্ব আদায় করা হবে কার কাছ থেকে, তা নিয়ে নীতি নির্ধারণ করতে গিয়েও কোম্পানি সমস্যায় পড়েছিল। নবাবি আমলের জমিদারদের থেকে রাজস্ব আদায় করতেন নবাব। জমিদাররা চাষিদের থেকে খাজনা আদায় করত। সেই পদ্ধতিটি কোম্পানি-শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কাউকে আবার রেখে দেওয়া হয়। ফলে কর্নওয়ালিস যখন শাসনভার নেন তখন খাজনা আদায়ের পুরো প্রশাসনিক কাঠামোটি সমস্যার মুখে পড়েছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন বাংলায়ও জমিদারদের উন্নতি হোক। তাঁর ধারণা ছিল জমিদারদের সম্পত্তির অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ করা হলে তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করবেন। তাছাড়া অগণিত কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করার বদলে কম সংখ্যক জমিদারের থেকে খাজনা আদায় করা পদ্ধতি হিসেবে অনেক সহজ ছিল। পাশাপাশি জমিতে অধিকার স্থায়ী করার মাধ্যমে জমিদারদের কোম্পানির অনুগত গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল। এসব কারণে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির তরফে জমিদারদের সঙ্গে খাজনা আদায় বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমি জমিদারি সম্পত্তি হয়ে পড়ে। সমস্ত জমিতে নির্দিষ্ট কর ঠিক করা হয়। জমিদার সময় মতো সেই নির্ধারিত কর কোম্পানিকে দিতে পারলেই ঐ জমিতে তাঁর অধিকার স্থায়ী হতো। তাছাড়া ঐ জমির উপর জমিদারের চূড়ান্ত অধিকার ছিল। সেই অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রেও বজায় থাকত। জমি বিক্রি করতে বা হাত বদল করতেও পারতেন জমিদারেরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত খাজনা জমা দিতে না পারলে জমিদারের জমি কোম্পানি কেড়ে নিত। সেই জমি নিলাম করে নতুন কোনো ব্যক্তির হাতে জমিদারির অধিকার তুলে দেওয়া হতো। এইভাবে জমি ক্রমেই জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল এর মাধ্যমেই জমিদারদের স্বার্থ ও কৃষির উন্নতি — দুইই নিশ্চিত করা যাবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের সমৃদ্ধি বাড়লেও কৃষকের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। কৃষকরা জমিদারের অনুগ্রহ-নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকেরও জমির উপর দখলি স্বত্ব ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকের স্বত্বকে খারিজ করে তাদের প্রজায় পরিণত করা হয়।

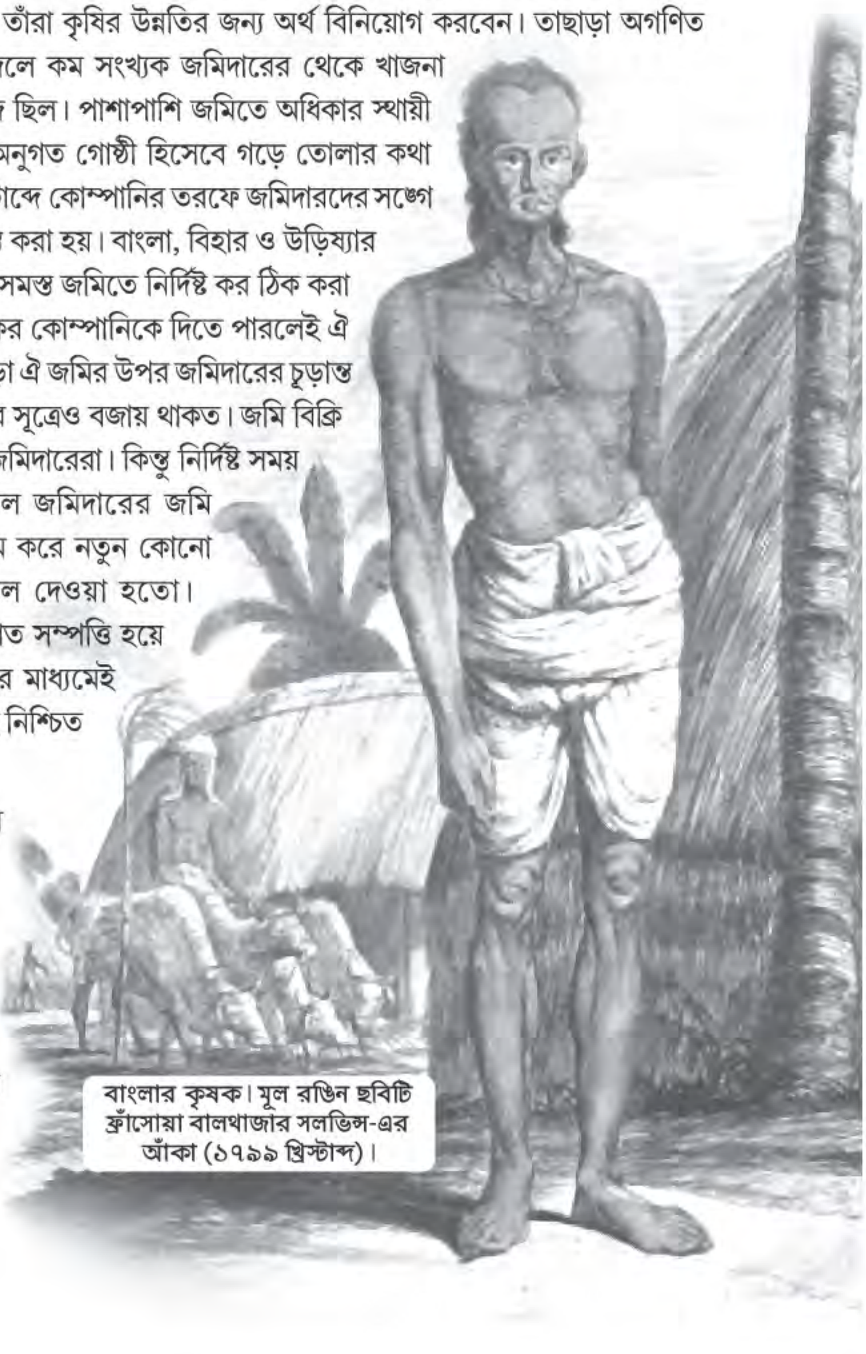

বাংলার কৃষক। মূল রঙিন ছবিটি ফ্রাঁসোয়া বালথাজার সলভিন্স-এর আঁকা (১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ)।

উঁচু হারে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপত। তাছাড়া প্রায়ই নানান *আবওয়াব* বা বেআইনি কর আদায় করা হতো কৃষকদের থেকে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট খাজনা দিতে না পারলে কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও জমিদারকে দেওয়া হয়। ফলে নানা দিক থেকে চাপে পড়ে কৃষকের অবস্থার অবনমন হতে থাকে।

চড়া হারে কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করা জমিদারের পক্ষে সমস্যা ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকেরা চড়া হারে খাজনা দিতে পারতেন না। তাই রাজস্ব দিতে না পারার কারণে জমিদারদের জমি নিলামে উঠত। বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে কোম্পানির কর্তৃত্ব ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে দৃঢ় হয়েছিল।

টুকরো কথা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব : বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।.... জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।....

....

....ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী"।

কর্ণ্ওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন— জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনারেল্ যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবন্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"

"বিধিবন্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না।"

[উদ্ধৃতাংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা
সূর্যাস্ত আইন

জমিদারদের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি সমস্যার দিক ছিল। আপাতভাবে জমির অধিকার জমিদারের দখলে থাকলেও, বাস্তবে সমস্ত জমির চূড়ান্ত মালিকানা কোম্পানির হাতেই ছিল। নির্দিষ্ট একটা তারিখের মধ্যে প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানিকে জমা দিতে হতো। এই ব্যবস্থা *সূর্যাস্ত আইন* নামে পরিচিত ছিল। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্য ডোবার আগেই প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানিকে জমা দিতে না পারলে জমিদারের সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার কোম্পানির ছিল।

জন শোর (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

ফিলিপ ফ্রান্সিস (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

থমাস মানরো (রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম উৎসাহী ব্যক্তি)

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কোম্পানি-শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ঐ অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ততদিনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পর্কে কোম্পানির অনেক আধিকারিকের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া মাদ্রাজ অঞ্চলে বড়োমাপের জমিদার বিশেষ ছিল না। ফলে সেখানে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত সরাসরি কৃষকের সঙ্গেই করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। সেক্ষেত্রে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব জমিদারদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার দরকার হতো না। তাছাড়া কৃষক বা *রায়ত*কে জমির মালিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের উপর জমিদারের অত্যাচারকে এড়ানো যাবে বলে মনে করা হতো। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের শর্ত ছিল ঠিক সময়ে রায়তকে ভূমি-রাজস্ব জমা দিতে হবে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করা হয়। তবে ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হয় নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্বের পরিমাণ সংশোধন করা হতো। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে স্থানীয় জমিদারের বদলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চলে যেতে থাকে কৃষক সমাজ।

বাস্তবে জমিতে কৃষকের কোনো মালিকানা বা অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। কৃষকরা আসলে ঔপনিবেশিক শাসকের *ভাড়াটে চাষি* হিসাবে জমিতে চাষের অধিকার পেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন সময়মতো রাজস্ব দিতে না পারলে জমি থেকে তাঁদের উৎখাত করে সেই জমি অন্য কৃষককে দিয়ে দেওয়া হবে। কার্যত ঔপনিবেশিক প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল যে, রায়তের প্রদত্ত ভূমি-রাজস্ব কর নয়, খাজনা। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক অংশেই সেই খাজনার হার ছিল উঁচু। কোথাওবা মোট উৎপাদনের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ খাজনা নেওয়া হতো। এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলেও খাজনার হারে রদবদল করা হতো না।

মহলওয়ারি ব্যবস্থা

মহল কথাটির একটা অর্থ কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। ফলে *মহলওয়ারি* বলতে আদতে গ্রামভিত্তিক বোঝানো হতো। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে *মহলওয়ারি বন্দোবস্ত* চালু করা হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার মহলের জমিদার বা প্রধানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। অবশ্য সেই চুক্তির মধ্যে গোটা গ্রাম সমাজকেই ধরা হয়েছিল।

মহলওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও কৃষক সমাজের বিশেষ সুরাহা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্ব-হার সংশোধন করা হতো। ফলে প্রায়ই উঁচু হারে রাজস্ব ধার্য করা হতো। অতএব রাজস্বের বাড়তি বোঝা, তা মেটাতে ধার করা, ধার শোধ দিতে না পারায় অত্যাচার— এসবেরই মুখোমুখি হতে হতো কৃষকদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে জমিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ রাজস্বনীতির প্রভাব

বস্তুত দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজস্ব বিষয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রধানত তিন ধরনের বন্দোবস্ত চালু করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় জমিদারদের সঙ্গে। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয় রায়ত বা চাষির সঙ্গে এবং মহলওয়ারি বন্দোবস্ত করা হয় গ্রামের সম্প্রদায়ের সঙ্গে। তিনটি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক নানা হেরফের দেখা গিয়েছিল। তবে আদতে ব্রিটিশ কোম্পানি-শাসনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। তার ফলে সবথেকে বেশি চাপ বেড়েছিল কৃষক সমাজের উপরে। সেই চাপের ফলে ক্রমেই দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য দেখা যেতে থাকে। বস্তুত দেখা গিয়েছিল যেসব অঞ্চলে রাজস্ব বন্দোবস্ত অস্থায়ী ছিল, সেখানে কৃষকরা বেশি সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। তবুও বেশি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজস্ব হার সংশোধনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখে।

বস্তুত, দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক ভূমি-রাজস্বনীতি ও বন্দোবস্তগুলির নানারকম প্রভাব পড়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদারিগুলিতেও কৃষকের অবস্থা বিশেষ ভালো হয়নি। জমির ও কৃষির উন্নতি তথা কৃষকের জীবনযাপনের উন্নয়নে জমিদাররা বিশেষ উদ্যোগ নিতেন না। বরং বাংলার গ্রাম-সমাজে কৃষকদের নানাভাবে হেনস্থা করার উদাহরণ প্রবল হয়ে ওঠে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

টুকরো কথা

বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা : অক্ষয়কুমার দত্ত-র আলোচনা

"....''যে রক্ষক সেই ভক্ষক" এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামি স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহারদের দারিদ্র্য দশা, শীর্ণ শরীর ম্লান বদন, অতি মলিন চীরবসন কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না— কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারিবিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্ব্বাণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন।....

....

....নায়েব আর গোমস্তা নিতান্ত নির্ম্মায়িক হইয়া প্রজাদের উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে। ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্ব্বেই আপন আপন ভাগ গ্রহণ করে, এবং সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে।...."

[উদ্ধৃত অংশটি অক্ষয়কুমার দত্ত-র 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা' প্রবন্ধের থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের অধীন কৃষকদের অবস্থাও খুব একটা আলাদা ছিল না। বরং জমিদারদের বদলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনই সেখানে শোষকের ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখে পড়ায় ক্রমশ জমির আয়ের উপর বেশি মানুষ নির্ভর করতে শুরু করেন। ফলে জীবিকা হিসাবে কৃষিতে চাপ বেড়েছিল। পাশাপাশি, জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরাও গ্রামগুলিতে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে থাকে। তার ফলে গ্রামের গরিব কৃষককে ঔপনিবেশিক শাসক ও দেশীয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফলে গ্রাম-সমাজে আরেকরকম বদলও ঘটেছিল। তা হলো পুরোনো অনেক জমিদাররা তাঁদের অধিকার হারিয়েছিলেন। অনেক নতুন ব্যবসায়ী, মহাজন ও শহুরে পেশার মানুষেরা গ্রামে জমিদারি কিনে নিয়েছিলেন। ফলে গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছিল। পুরোনো জমিদারদের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক নতুন জমির মালিকদের ক্ষেত্রে বদলে গিয়েছিল। তাছাড়া নতুন জমির মালিকেরা অনেকেই তাঁদের জমিদারিতে বাস করতেন না। ফলে, জমির ও কৃষির উন্নতি তথা কৃষকের ভালোমন্দ নিয়ে তাঁদের বিশেষ ভাবনাচিন্তা ছিল না। কেবল কর্মচারীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রতি তাঁদের মনোযোগ ছিল।

টুকরো কথা
মহাজনি ব্যবস্থা

ঔপনিবেশিক আমলে গ্রাম-সমাজে মহাজনদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। বেশি হারে নগদ রাজস্বের দাবি মেটাতে চাষিরা মহাজনের থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিত। নানা ক্ষেত্রেই কৃষকের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে মহাজনরা হিসাবের কারচুপি ও জালিয়াতি করে সুদ আদায় করে যেত। তাছাড়া কোম্পানির নানা আইনের ফলে ক্রমে মহাজনরাই জমির দখল নিতে শুরু করে। আইন-ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত মহাজনরা। ফলে, মহাজনি ব্যবস্থা ও মহাজন ক্রমেই গ্রামের কৃষকের আক্রমণ ও বিরোধিতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মহাজনি ব্যবস্থা ও মহাজনদের উপরে আক্রমণ।

মহাজনের কবলে দরিদ্র মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ

ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতির আরেকটি দিক ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। অর্থাৎ, বাণিজ্যের কাজে প্রয়োজন বিভিন্ন কৃষিজ ফসল চাষের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব পড়েছিল। যেমন, চা, নীল, পাট, তুলো প্রভৃতি ফসল চাষ করার জন্য কৃষকের ওপর জোর দিয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার। বস্তুত রেলপথ বানানো, রফতানির হার বাড়ানো ও কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে *'অর্থনীতির আধুনিকীকরণ'* বলে ব্যাখ্যা করা হতো।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে কী কী ফসল চাষ হয়? সেগুলির কোনটা কোনটা খাদ্যশস্য? কোনটা বাণিজ্যিক শস্য? তোমার স্থানীয় অঞ্চলের একটি ফসল-মানচিত্র তৈরি করো।

এখন প্রশ্ন হলো আদৌ কী ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল? প্রসঙ্গত বলা চলে কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাবার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে বিশেষ উদ্যোগ ছিল না। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কয়েকটি খাল খনন করা হয়েছিল। অবশ্য ঐ অঞ্চলগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না। ফলে ঐসব খাল খননের বদলে জমির খাজনার হার বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন। তবে সরকারি সেচ ব্যবস্থা ছিল চাহিদার তুলনায় সামান্য। সেচ ব্যবস্থার আসল সুবিধা পেত তুলনায় ধনী কৃষকেরা। কারণ, খালের জল ব্যবহারের জন্য উঁচু হারে কর দেওয়ার সামর্থ্য কেবল তাদেরই ছিল। বাস্তবে গরিব কৃষিজীবীদের সমস্যার কোনো সমাধানই হয়নি। তারা বড়ো জমিদার ও কৃষকের অধীনে ভাগচাষি হিসাবেই কাজ করতে বাধ্য হতো। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়েনি। ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে দুর্ভিক্ষ ছিল ঘটমান বর্তমান।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভারতীয় কৃষকসমাজে পারস্পরিক ভেদাভেদ তৈরি হয়েছিল। কৃষির আধুনিকীকরণের সঙ্গে মূলধন জোগাড় করা ও বাজারের চাহিদা মতো কৃষিজ ফসল উৎপাদনের বিষয়গুলি জড়িত ছিল। অথচ নানা কারণে এই বিষয়গুলিতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে কৃষির উন্নতি যা হতো, তাতেও কৃষকের সরাসরি লাভ বিশেষ হতো না। মূলধন বিনিয়োগকারীই বেশিরভাগ মুনাফা করতেন।

পূর্ব ভারতে নীলচাষকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নীল চাষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দশ জন নীলকরকে চাষের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছিল। সেই নীলকররা বাংলায় নীল চাষে উদ্যোগী হন। কোম্পানি অবশ্য বাগিচা কৃষি হিসাবে নীলচাষের বিষয়টা ভাবেননি। কারণ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জমি কেনার বিষয়ে নীলকরদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে নীলকররা প্রথমে স্থানীয় কৃষকদের নীলচাষের জন্য রাজি করাতে চেষ্টা করে। অবশ্য তাতে কাজ না হলে জোর করে অগ্রিম টাকা বা *দাদন* দিয়ে চাষিদের বাধ্য করা হতো নীলচাষ করতে। এরই ফলে নীলচাষের

বিষয়কে ঘিরে বাংলার অনেক অঞ্চলেই কৃষকের সঙ্গে নীলকর ও কোম্পানির সংঘর্ষের পথ তৈরি হতে থাকে।

নীলের চাষ পুরোটাই করা হতো ইংল্যান্ডের কাপড় কলে নীলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে। কিন্তু এই সময় রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরি করা শুরু হয়। ফলে নীলের চাহিদা সবসময় এক থাকত না। তাছাড়া ক্রমেই নীলচাষ করার জন্য দমন-পীড়ন করা শুরু হয় চাষিদের উপরে। তারই ফলে বাংলায় নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-'৬০ খ্রিস্টাব্দ) ঘটেছিল।

টুকরো কথা

বাগিচা শিল্প

নীলচাষ ছাড়াও বিভিন্ন বাগিচা শিল্পে ইউরোপীয়দের উৎসাহ ছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আসাম, বাংলা, দক্ষিণভারত ও হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে চা-বাগিচা শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। চা-বাগিচার মালিকানা বিদেশি হাতে থাকায় সেইসব জমিগুলির জন্য ঔপনিবেশিক সরকার কর ছাড় দিয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য নানা সুযোগ-সুবিধাও পেত বাগিচা শিল্পগুলি। ক্রমে বিদেশে রফতানির ক্ষেত্রে চা একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতে কফি বাগিচারও বিকাশ হয়।

অবশ্য বাগিচা শিল্পগুলির বিকাশে ভারতীয় জনগণের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা হয়নি। কারণ বিদেশি মালিকানাধীন ঐ শিল্পের যাবতীয় মুনাফা দেশের বাইরে চলে যেত। আর বেতনের বেশির ভাগটাই পেত বিদেশি কর্মচারীরা। উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বিদেশের বাজারে বিক্রি করে তার অর্থ ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হতো।

বাংলার একটি নীল-কারখানা। মূল ছবিটি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

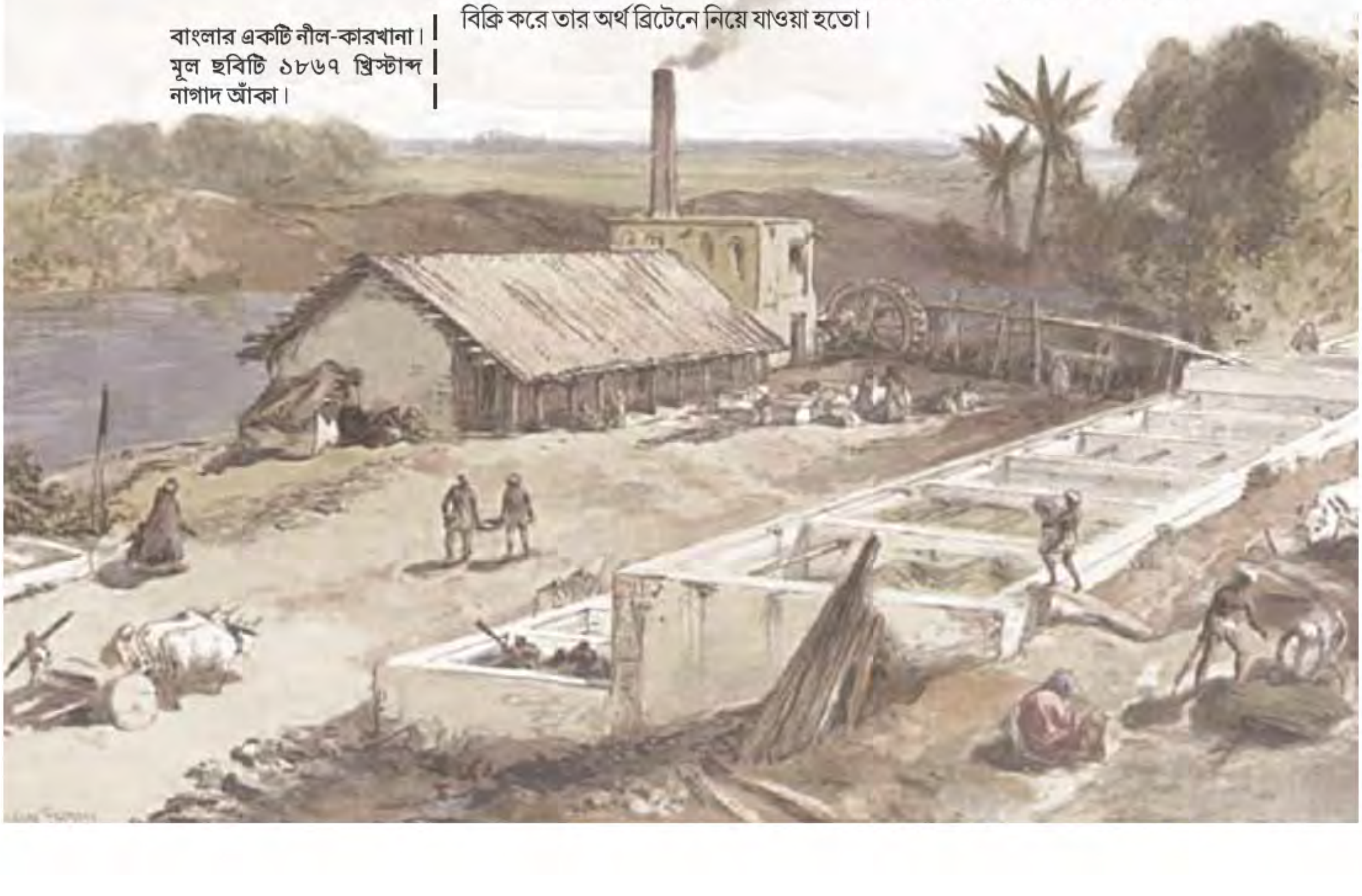

অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয় কৃষক কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, ভারতীয় কৃষক সমাজের উপরে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের কী প্রভাব পড়েছিল? বাস্তবে কৃষি-উন্নতির বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধাটাই আর্থিকভাবে শক্তিশালী কৃষিজীবীরা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাই তার সুফলটুকুও তাঁরাই পেয়েছিলেন। অধিকাংশ কৃষকেরই অবশ্য এর ফলে কোনো লাভ হয়নি।

বিরাট সংখ্যক কৃষকের পক্ষে কৃষির উন্নতির জন্য ভালো গবাদি পশু, উন্নত বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজস্বের চড়া হারের ফলে কৃষি থেকে কৃষকের উপার্জন কম হতো। বস্তুত, কৃষিজাত লাভের বেশিটাই ঔপনিবেশিক সরকার, জমিদার ও মহাজনদের হাতে চলে যেত। ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে কৃষক-স্বার্থরক্ষার কোনো বিশেষ নীতি ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ক্রমেই কৃষি শ্রমিক বা ভাগচাষিতে পরিণত হয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অতিরিক্ত ঋণের ভারে কৃষকরা প্রায়ই দাসে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলায় অনেক কৃষক জমি হারিয়ে ভাগচাষি বা *বর্গাদারে* পরিণত হন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে রেলপথ বসানোর জন্য প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা খরচ করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। অথচ ঐ পর্যায়ে কৃষিতে জলসেচের কাজে খরচ করা হয়েছিল ৫০ কোটি টাকারও কম। যদিও রেলপথের থেকে জলসেচের উন্নতিতে ভারতের বেশি মানুষ লাভবান হতো। দেশীয় অনেক বুদ্ধিজীবী এই যুক্তিতে ইংরেজ সরকারের রেলপথ প্রকল্পকে সমালোচনাও করেছিলেন।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রভাবে কার্পাস তুলোর চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলে দাক্ষিণাত্যে কার্পাস তুলোর চাষ বেড়ে যায়। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর দাক্ষিণাত্যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুলোর দাম একদম কমে যায়। তার উপরে চড়া হারে রাজস্বের চাপ ছিল কৃষকের উপর। সেই সময় খরা ও অজন্মার ফলে কৃষকসমাজ চূড়ান্ত দুর্দশার মুখে পড়েছিল। সেই দুর্দশার সুযোগ নিয়েছিল স্থানীয় *সাহুকার* মহাজনেরা। সাহুকারেরা চাষিদের ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করত। এর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের তুলো চাষিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাহুকারদের আক্রমণ করে তাদের দখলে থাকা কাগজপত্রগুলি পুড়িয়ে দেয় বিদ্রোহী চাষিরা। আহমদনগর ও পুনা জেলায় বিদ্রোহ তীব্র আকার নিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলা ঐ বিদ্রোহকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন *'দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা'* নাম দিয়েছিল।

ভারতের একটি চা বাগিচা। মূল ছবিটি দ্য গ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

আসামের চা বাগান ও শ্রমিক অধিকার

বাগিচা শিল্পের শ্রমিক হিসেবে স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করা হতো। সামান্য মজুরি ও চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে কাজ করতে হতো ঐ শ্রমিকদের। ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। নিজের চোখে আসামের চা-বাগানগুলি ঘুরে দেখে শ্রমিকদের উপর ইউরোপীয় মালিকদের অত্যাচারের খবর *সঞ্জীবনী* পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। সেই সময় দ্বারকানাথের সঙ্গী রামকুমার বিদ্যারত্নও ধারাবাহিক ভাবে সঞ্জীবনী পত্রিকায় *'কুলী-কাহিনী'* নিবন্ধ লিখতে থাকেন। দ্বারকানাথ ও রামকুমারের উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত দেশের লোকের ও ঔপনিবেশিক শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করার সেটি অন্যতম পুরোনো নজির।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে কৃষকদের জন্য আইন

দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহগুলির ফলে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে Agriculturists' Relief Act (কৃষকদের সুবিধার জন্য আইন) জারি করে ঔপনিবেশিক প্রশাসন। ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল ঋণগ্রস্ত চাষিদের উপর থেকে অত্যাচারের বোঝা কিছুটা কমানো। ধার শোধ করতে না পারলে চাষিদের গ্রেফতার আটক করা নিষিদ্ধ হয়। তার বদলে গ্রামেই বিচার সভা বসিয়ে সাহুকার ও চাষিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা উপর জোর দেওয়া হয়।

একই ভাবে বাংলায়ও জমিদারের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের Tenancy Act (প্রজাস্বত্ব আইন) অন্যতম। ঐ আইন মোতাবেক অস্থায়ী রায়তদের দখলি স্বত্ব দেওয়া হয়। সেখানে স্পষ্ট বলা হয় আদালতের পরোয়ানা ছাড়া কোনো রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। খাজনা বাড়ানোর সময়ও জমিদারকে নির্দিষ্ট কারণ দর্শাতে আদেশ দেওয়া হয় ঐ আইনে। তবে দাক্ষিণাত্যে এবং বাংলায় বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিক ও ভাগচাষিদের স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর ছিল না ঔপনিবেশিক প্রশাসনের।

শিল্প-বাণিজ্য-শুল্কনীতি

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবেই কাজ করত। দামি ধাতু, নানারকম জিনিসপত্র তারা ভারতে আমদানি করত। তার বদলে কোম্পানি মশলাপাতি ও কাপড় রফতানি করত ব্রিটেনে।

কিন্তু, ব্রিটেনের বস্ত্র উৎপাদকরা কোম্পানির এই রফতানিতে খুশি ছিল না। তারা ব্রিটেনের সরকারকে চাপ দিতে থাকে যাতে ব্রিটেনে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রি আইন করে বন্ধ করা হয়। সেই মোতাবেক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ব্রিটেনে সুতির কাপড় ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অন্যান্য কাপড় আমদানির উপরেও চড়া শুল্ক চাপানো হয়েছিল। কিন্তু, এ সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ডে কাপড় শিল্পে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো ও দ্রব্যের মান ভালো করা হতে থাকে। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায়

কলকাতার কাছে গঙ্গা নদীতে নৌ-পরিবহনের একটি দৃশ্য। মূল ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (আনু. ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

চলে যেতে থাকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার রাজস্বের অর্থ খরচ করে কোম্পানি ভারতীয় দ্রব্য রফতানি করত। তার পাশাপাশি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশীয় বাণিজ্যের শুল্কনীতি নির্ধারণ করতে শুরু করে ব্রিটিশ কোম্পানি। বাংলার তাঁতিদের সস্তায় দ্রব্য বিক্রি করতে বা কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দাম মেনে নিতে বাধ্য করা হতো। এর ফলে তাঁত শিল্পে ক্ষতি হতে শুরু হয়। অনেক তাঁতি সামান্য মজুরিতে কোম্পানির হয়ে বস্ত্র উৎপাদন করতেন। ভারতীয় ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশি বণিকদের ভারতের বাজার থেকে হঠিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি।

তাছাড়া বাংলার হস্তশিল্পীদের তৈরি জিনিস যাতে বেশি দামে কেনা না হয় তার জন্যেও নজরদারি রাখত ব্রিটিশ কোম্পানি। কাঁচা সুতো বিক্রির ব্যবসায় কোম্পানির একাধিপত্য তৈরি হয়েছিল। তার জন্য বাংলার তাঁতিদের চড়া দামে কাঁচা সুতো কিনতে হতো। চড়া দামে কাঁচামাল কেনা ও সস্তা দামে তৈরি দ্রব্য বিক্রিতে বাধ্য হওয়ার ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একদিকে বিদেশের বাজার হারিয়েছিল ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, অন্যদিকে দেশের ভিতরে বিদেশি পণ্যের সঙ্গে তাদের পাল্লা দিতে হয়েছিল। দু-দিক থেকে আক্রান্ত ভারতীয় বস্ত্র ও হস্তশিল্প এর ফলে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বদলে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে পড়ে।

টুকরো কথা

অবশিল্পায়ন

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের বাজারের একচেটিয়া অধিকার চলে যায়। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন ব্রিটিশ পণ্য ভারতে আমদানি করা হতে থাকে। তার ফলে নানারকম বৈষম্যমূলক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে ভারতের দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমে ধ্বংস হতে থাকে। ভারতীয় শিল্পের অবলুপ্তির ঐ প্রক্রিয়াকে *অবশিল্পায়ন* বলা হয়। ব্রিটেনে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্প ক্রমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঐ শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন ধরনের মানুষ তার ফলে জীবিকাহীন হয়ে পড়েন।

বিপুল সংখ্যক কর্মচ্যুত শিল্প শ্রমিক ও কারিগররা জীবিকার জন্য কৃষিকাজে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তার ফলে কৃষি অর্থনীতির উপরেও বাড়তি চাপ পড়ে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিদেশি পণ্যে আরও বেশি করে ভারতের বাজারগুলি ছেয়ে গিয়েছিল। ফলে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পের অবনমন ঘটে। তাঁত,কাঠ ও চামড়ার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ ঐ জীবিকাগুলি ছেড়ে দিয়ে সহজ লাভের আশায় রেলপথ ও রাস্তা বানানোর শ্রমিক হয়ে গিয়েছিলেন।

অবশ্য অবশিল্পায়ন নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। ভারতীয় অর্থনীতির উপর অবশিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করেছিলেন।

স্পষ্টতই বোঝা যায় ব্রিটিশ অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রভাব ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতির উপরে নেতিবাচক ছিল। যেসব ভারতীয় দ্রব্য তখনও ব্রিটেনে জনপ্রিয় ছিল সেগুলির উপরে চড়া হারে শুল্ক বসানো হতে থাকে। সেই শুল্ক ততক্ষণ বাড়ানো হতো, যতক্ষণ ঐ দ্রব্যের রফতানি বন্ধ না হয়ে যায়। এসবের ফলে ক্রমেই তৈরি দ্রব্য রফতানির বদলে কাঁচামাল রফতানি করা হতে থাকে ভারত থেকে। তার ফলেই ভারতের নীল, চা প্রভৃতি ব্রিটেনে রফতানি করা হয়। সেইগুলি ব্রিটেনে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কদর পেতে থাকে।

কাঁচামাল রফতানির ক্ষেত্রে কাঁচা সুতো ছিল অন্যতম প্রধান। সেই সুতোর তৈরি কাপড় ব্রিটিশরা ভারতের বাজারে আমদানি করত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে পর থেকেই ব্রিটেনের শিল্প-চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শিল্পনীতি নির্ধারিত হতে থাকে। উপনিবেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ক্রমেই কাঁচামালের রফতানি ও ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যের আমদানির বাজারে পরিণত হতে থাকে।

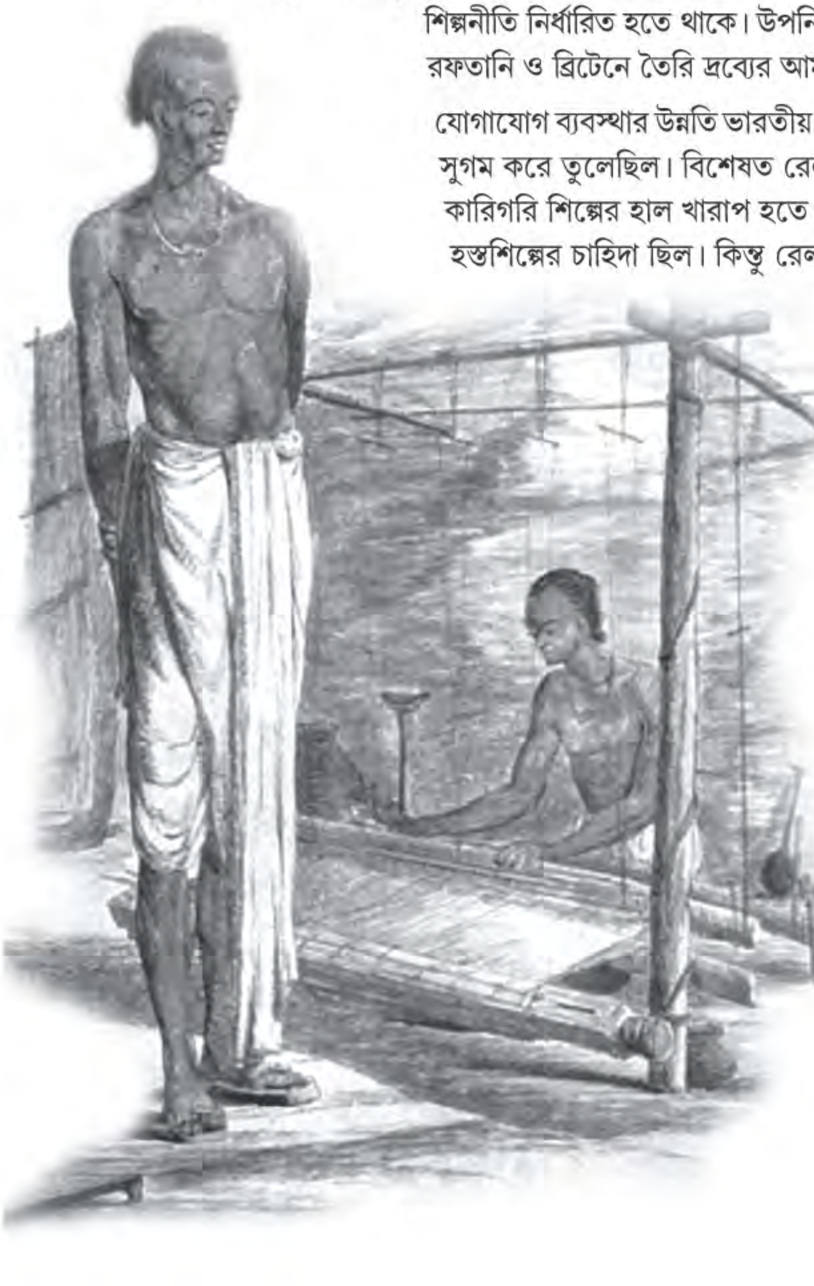
বাংলার তাঁতি। মূল ছবিটি ফ্রাঁসোয়া বালথাজার সলভিন্স-এর আঁকা।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ভারতীয় বাজারকে বিস্তৃত করে ব্রিটিশ পণ্য চলাচল সুগম করে তুলেছিল। বিশেষত রেলপথের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের হাল খারাপ হতে থাকে। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলির ভেতরে গ্রামীণ হস্তশিল্পের চাহিদা ছিল। কিন্তু রেলপথের মাধ্যমে গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পড়ার ফলে গ্রামের স্থানীয় বাজারেও ব্রিটিশ দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ পণ্যদ্রব্যগুলি পিছু হঠতে থাকে।

হস্তশিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে অনেকগুলি শহরও ক্রমে আগের জৌলুশ হারাতে থাকে। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সুরাট প্রভৃতি শহরগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামগ্রিকভাবে শহরের জনসংখ্যা কমেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। পাশাপাশি, কাজ হারানো শিল্পী ও কারিগরেরা চাষের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাতে কৃষির উপরেও চাপ বাড়ে। সেই চাপ সামলাবার মতো সামর্থ্য কৃষির ছিল না। ফলে ভারতে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে পড়ে।

টুকরো কথা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'রত্ন'

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে পরবর্তী দেড় শতকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় খরচ ভারত থেকেই আদায় করতে হবে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ভাবে ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। ভারতের বাজার ব্রিটিশ পণ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারে তৈরি সুতির কাপড়ের ৮৫ শতাংশ ভারতে বিক্রি হতো। ভারতীয় রেলের ব্যবহৃত লোহা ও ইস্পাতের ১৭ শতাংশ আসত ব্রিটেন থেকে। অর্থাৎ, উপনিবেশ হিসাবে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অভিমুখ শাসক ব্রিটেনের স্বার্থেই পরিচালিত হতো। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকেই সবচেয়ে দামি 'রত্ন' হিসাবে বর্ণনা করা হতো।

উপনিবেশ হিসেবে ভারতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক নীতিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা একটি ছবি। মূল ছবিটি ইংল্যান্ডের পাঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ)।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে বেশ কিছু যন্ত্র-নির্ভর শিল্প তৈরি হতে থাকে। ১৮৫০ এর দশকে সুতির কাপড়, পাট ও কয়লা শিল্প তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম সুতির কাপড় তৈরির কারখানা চালু হয়। হুগলির রিষড়ায় প্রথম পাটের কারখানা চালু হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ধীরে ধীরে সুতির কাপড় ও চটকল শিল্পে অনেক লোক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতে থাকে। বিংশ শতকের গোড়ায় চামড়া, চিনি, লৌহ-ইস্পাত ও বিভিন্ন খনিজ শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

এই সব শিল্পগুলিতে বেশিরভাগ ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ হতো। সস্তার শ্রমিক ও কাঁচামাল এবং চড়া হারে মুনাফা ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে। ভারত ও আশেপাশের দেশগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির বাজারও ছিল। তাছাড়া ঔপনিবেশিক সরকারও ঐ শিল্পগুলিকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। তবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা সেই সহযোগিতা পাননি। কেবল সুতির কাপড় তৈরির শিল্পে অনেক ভারতীয় বিনিয়োগকারী ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়ার অথবা ব্যাঙ্কের সুদের হারের ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। ধীরে ধীরে অবশ্য দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

বোম্বাইয়ের একটি তুলোর আড়ত। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তোলা।

সরকারের পরিবহন ও রেল ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঐ বৈষম্য লক্ষ করা যেত। দেশীয় দ্রব্য পরিবহনের জন্য রেল মাশুলের হার ছিল চড়া। বরং বিদেশি দ্রব্য আমদানি করে কম খরচে বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা ছিল। এসবের ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি মূলত সুতি ও পাট শিল্পে আটকে ছিল। এমনকি ব্রিটিশ উৎপাদকেরা ঔপনিবেশিক সরকারকে দেশীয় শিল্প-বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যেত। তাছাড়া দেশীয় শিল্পোদ্যোগগুলি কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সার্বিক শিল্পায়নের সুবিধা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে দেখা যায়নি।

বোম্বাইয়ের ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়া। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৬০-এর দশকের।

রেলব্যবস্থা

ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রতীক ছিল রেলব্যবস্থা। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন এলাকা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবে রেলপথ বানানোর পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আদতে ভারতের উন্নতির কারণে রেলপথ বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। বরং ঔপনিবেশিক শাসনকে গতিশীল করাই ছিল রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। লর্ড ডালহৌসির আমলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প শুরু হয়। ডালহৌসির মূল উদ্দেশ্য ছিল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দ্রুত সেনাবাহিনীর যাতায়াত নিশ্চিত করা। পাশাপাশি বন্দর, শহর ও বিভিন্ন বাজার এবং কাঁচামাল উৎপাদনের জায়গাগুলিকে রেলপথ দিয়ে সহজে যুক্ত করার পরিকল্পনাও ছিল। তার ফলে ভারতের বাজারকে ব্রিটিশ পণ্যের বাণিজ্যের উপযোগী করে তোলা সহজ হতো।

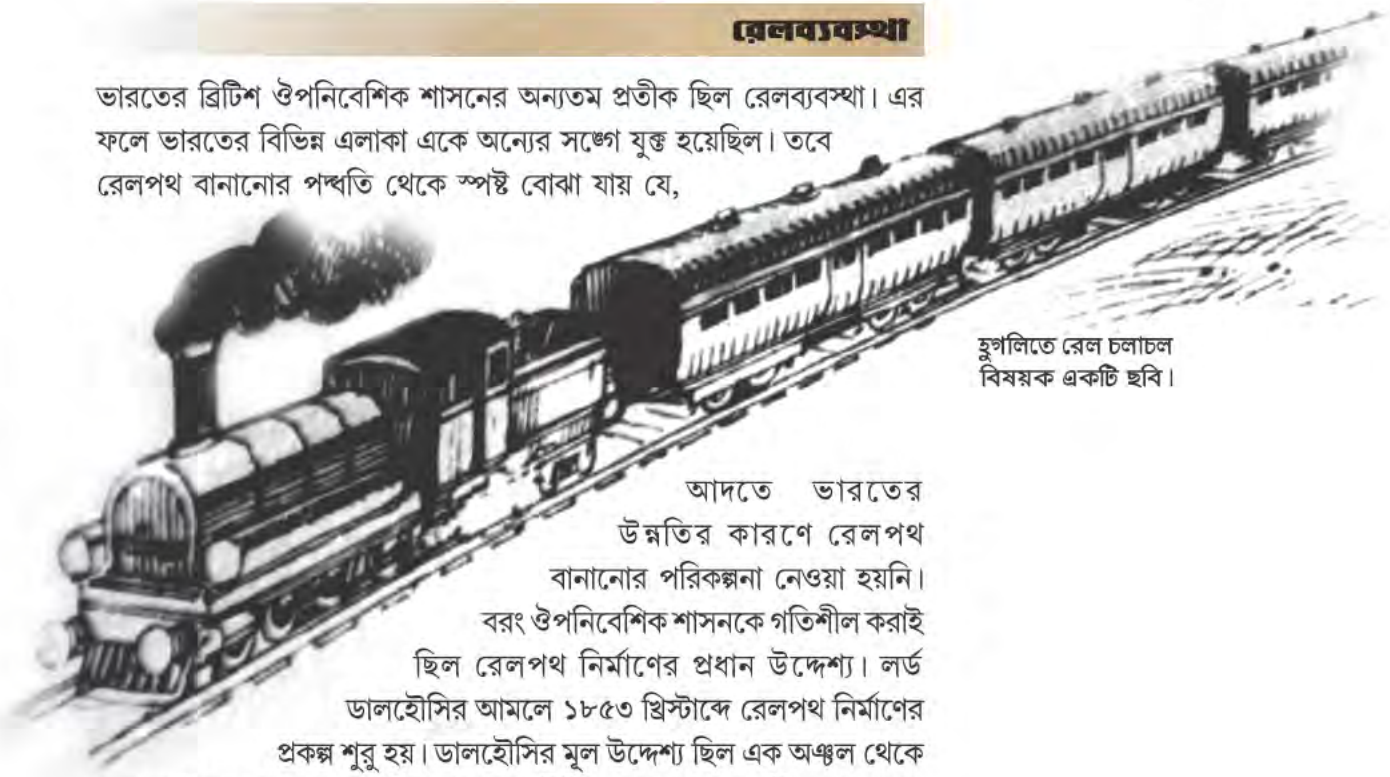

হুগলিতে রেল চলাচল বিষয়ক একটি ছবি।

রেলপথ নির্মাণের ব্যয়বহুল প্রকল্পে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে উপনিবেশের রাজস্ব থেকে পাঁচ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যেসব কোম্পানিগুলি রেলপথ বানানোর দায়িত্ব পেয়েছিল তাদের নিরানব্বই বছরের চুক্তিতে জমি দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিগুলি থেকে রাজস্ব নেওয়া হতো না। বলা হয়েছিল, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে রেলপথ ব্রিটিশ সরকারের দখলে চলে যাবে। যদিও মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় কোম্পানিগুলি রেলপথ সরকারকে ফেরৎ দিয়ে মূলধন বাবদ যাবতীয় খরচ সরকারের কাছে দাবি করতে পারত। সেক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পটি বিভিন্ন কোম্পানির মূলধন বিনিয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ফলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭কোটি পাউন্ডেরও বেশি মূলধন ভারতের রেলপথ নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

রেলপথের সেনা পাঠানোর একটি ছবি।

উপনিবেশের আর্থিক উন্নয়নের বদলে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষাই রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচুর ব্রিটিশ পণ্য বন্দরগুলি থেকে দেশের ভিতরের বাজারগুলিতে রেলপথের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া হতো। তার জন্য ভাড়া লাগত খুবই কম। অথচ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে রফতানির জন্য পণ্য বন্দরে আনতে হলে রেলে অনেক বেশি ভাড়া লাগত। সেইভাবেই কাঁচামাল পরিবহনের ক্ষেত্রেও রেলভাড়ার বৈষম্য ছিল।

নিজে করো

একটি হিসেব অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রতি মাইল রেললাইন বসাতে নাকি ২০০০ টি স্লিপার লাগত। যদি পাঁচটি স্লিপার বসাতে গড়ে একটি প্রমাণ মাপের গাছ কাটা হয়, তাহলে প্রতি মাইল স্লিপার পিছু কতগুলি গাছ কাটা হয়েছিল? এর ফলে পরিবেশের উপর রেলপথের কী প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়?

ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পের ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছিল। রেলপথ বানানোর সমস্ত সরঞ্জাম, লোহা এমনকি কিছুদিন পর্যন্ত কয়লাও ব্রিটেন থেকে নিয়ে আসা হতো। রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত সাধারণ প্রযুক্তিগুলি ভারতীয়দের শেখানো হতো। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিগুলি প্রয়োগ করার জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হতো। ফলে রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষা থেকে ভারতীয়দের সচেতন ভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া রেলপথ বসাতে গিয়ে স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থার ক্ষতি হতো। ফলে নানারকম সংক্রামক ব্যাধি রেলপথের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেলপথ নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক গাছ ও জঙ্গল কাটা পড়ে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়েছিল। তাছাড়া অরণ্যবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রেলপথ নির্মাণকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ রেলপথ বসাতে গিয়ে তাঁদের জমি, জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত করা হয়েছিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি অসন্তোষের একটি কারণ ছিল রেলপথ নির্মাণ।

রেলপথ বানানো নিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা
রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ভারতে রেলচলাচল চালু হওয়ার পরে রেলে চড়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই রকম একটি অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় মহানন্দ চক্রবর্তীর একটি বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটির নাম 'রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা'। সেই লেখায় মফস্‌সল থেকে রেলযোগে কলকাতায় যাওয়ার একটি চমৎকার বিবরণ রয়েছে। অনেকদিনের আয়োজনের পর কলকাতা যাওয়ার জন্য রেলে চাপতে চলেছেন মহানন্দ। তার বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি: ''দশ ঘন্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।/ ইষ্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি।।/.... হেনকালে জয়ঘন্টা বাজে আচম্বিতে।।/ঘন্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।/

....

ঘন্টা বাজাইয়া তারা দিল বিসর্জন।/মহাশব্দ করি পুন করিল গমন।।/পাশ হইতে নদনদী নগর এড়াইয়া।।/....ভাদ্র পদমাসে যেন নদী বেগমান্।/ সেইরূপ যায় নাই করয়ে বিশ্রাম।।/ বৈদ্যবাটী ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর এড়ায়।/দশ ঘন্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায়।।"

[মহানন্দ চক্রবর্তীর লেখার অংশগুলি চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

রেলপথ নির্মাণ ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে কতটা জরুরি, তা নিয়ে নানারকম মত ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন রেলপথের বদলে প্রশাসন যদি সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে নজর দিত তাতে সমাজের অনেক বেশি উপকার হতো। তাছাড়া ভারতের রাজস্ব থেকে রেলপথ নির্মাতা কোম্পানিগুলিকে সুদ দেওয়ার বিষয়টিও অনেকেই সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, এর ফলে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই দেশীয় সমাজে রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তবে বাস্তবে রেলপথ নির্মাণ ভারতের বাজারগুলিকে অনেক পরিমাণেই একজোট করেছিল। পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজতর হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

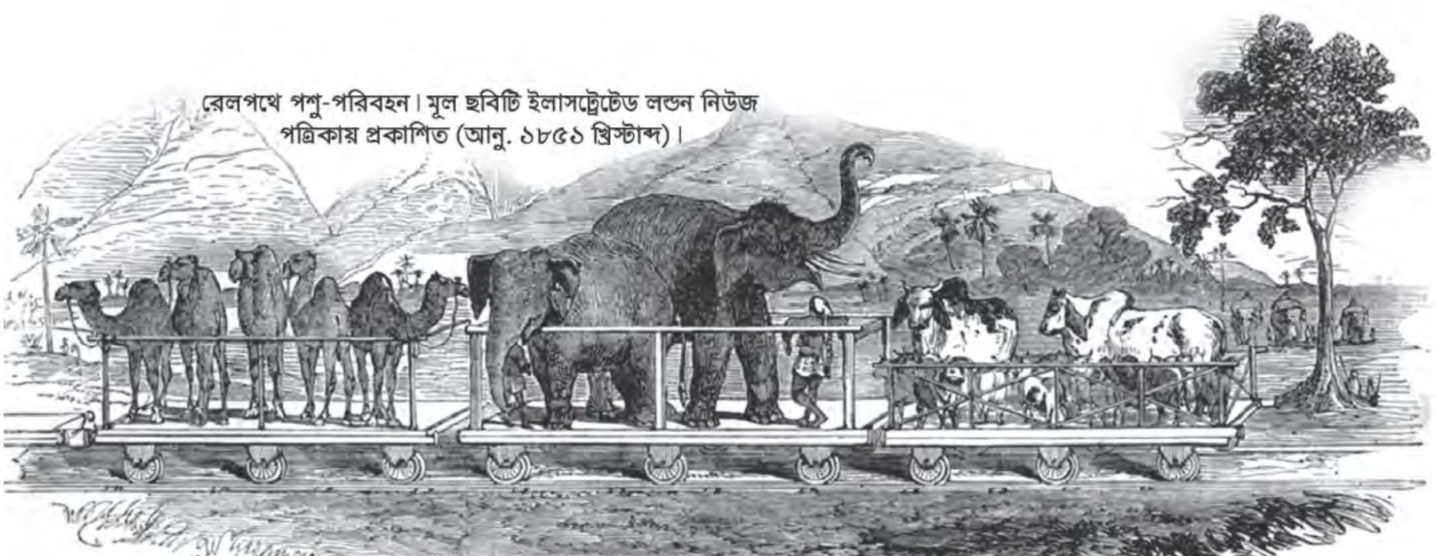

রেলপথে পশু-পরিবহন। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ)।

ঔপনিবেশিক ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশ

নিজে করো

সম্প্রতি কলকাতায় টেলিগ্রাফ অফিস বন্ধ হয়ে গেল। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে একটা চার্ট বানাও।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রেলপথের মতোই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন টেলিগ্রাফ প্রযুক্তির ব্যবহারকে জরুরি করে তোলে। বস্তুত রেলপথ ও টেলিগ্রাফের বিস্তার সহগামী হয়েছিল। রেলপথ বরাবর টেলিগ্রাফ লাইন তৈরি করা হয়। এমনকি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে রেল স্টেশনগুলির মধ্যে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হতো। তার মধ্যে দিয়ে রেলের সিগন্যাল ব্যবস্থা কার্যকর করা যেত।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ চালু হয়। তবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে ৪৬টি টেলিগ্রাফ কেন্দ্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৪ হাজার ২৫০ মাইলেরও বেশি অঞ্চল টেলিগ্রাফ যোগাযোগের আওতায় এসে গিয়েছিল। তার ফলে কলকাতা থেকে আগ্রা এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলি এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ওটাকামুন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৭ হাজার ৫০০ মাইল এবং উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ৫২ হাজার ৯০০ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল টেলিগ্রাফ লাইন।

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশের পিছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত জরুরি সংবাদ ও তথ্য অতি দ্রুত শাসনকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর দরকার ছিল। সেই কাজে টেলিগ্রাফ সবথেকে বেশি সহায়ক ও নির্ভরযোগ্য ছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের সময় (এপ্রিল, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনের পরাজয়ের খবর কলকাতায় বসে লর্ড ডালহৌসি টেলিগ্রাফের মারফতই পেয়েছিলেন। এমনকি বলা হতো যে, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ থেকে ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করেছিল। দূরদূরান্ত থেকে বিদ্রোহের সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোয় টেলিগ্রাফের মধ্যেমে পৌঁছে যেত।

বাংলার ডাকহরকরা। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)।

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা দ্রুতই ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসকের মতো ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ ক্রমেই টেলিগ্রাফের সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৮৭০

খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে টেলিগ্রাফ যোগাযোগের বিকাশ হয়। তার ফলে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য ভারতবর্ষের উপর আরও জোরাল হয়েছিল।

সম্পদের বহির্গমন

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতীয় অর্থনীতির চরিত্রের প্রসঙ্গটি মূলত তিনটি বিষয়কে ঘিরে বিতর্ক তৈরি করেছিল। যেগুলি হলো— সম্পদ নির্গমন, অবশিল্পায়ন ও দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য। এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের তরফে ঔপনিবেশিক সরকারের সমালোচনা করা হয়। বলা হতে থাকে, পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনের স্বার্থে ব্যবহার ও ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করে চলেছে। পাশাপাশি, অসম শিল্প-বাণিজ্য ও শুল্কনীতি ভারতের শিল্প ও কারিগরি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে। অতএব, এই দু'য়ের ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যগুলিকে যুক্তি ও তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে হাজির করা হয়েছিল।

উপনিবেশ হিসেবে ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনে নানাভাবে স্থানান্তরিত করা হতো। তার প্রতিদানে অবশ্য ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো না। এই ভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হওয়াকেই *'সম্পদের বহির্গমন'* বলে উল্লেখ করা হতো। সম্পদের এই বহির্গমন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বস্তুত সুলতানি ও মুঘল আমলেও দেশের জনগণের থেকে রাজস্ব আদায় করে শাসন ব্যয় চালানো হতো। কিন্তু, তার ফলে দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্য ভেঙে পড়েনি বা বন্ধ হয়ে যায়নি। এর অন্যতম কারণ, সুলতানি ও মুঘল শাসকেরা ভারতীয় উপমহাদেশেই স্থায়ীভাবে থাকতেন। অন্য কোনো দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল না। এদিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বরাবরই কোম্পানির ও সর্বোপরি ব্রিটেনের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কাজ করত। ফলে, তাদের কাজের যাবতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটেনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। আর তার জন্য আবশ্যক ছিল ভারতের অর্থ ও সম্পদ ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করা।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের সমসাময়িক)।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রিটিশ আধিকারিকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ভারত থেকে বছরে ২-৩ কোটি স্টার্লিং মূল্যের সম্পদ ব্রিটেনে যেত। যদিও তার বিনিময়ে ভারত সামান্য দামের কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ছাড়া কিছুই পেত না। বাস্তবে ভারতে সম্পদ বহির্গমনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন 'স্পঞ্জের মতো' কাজ করত। ভারত থেকে সম্পদ শুষে

ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও সম্পদ নির্গমন চলেছিল। বস্তুত ঐ শতক শেষ হওয়ার সময়ে ভারতীয় জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের ১/৩ অংশ সম্পদ নির্গত হয়ে যেত। হিসাবে দেখা গেছে ঐ কালপর্বে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশ ছিল ভারত থেকে নির্গত সম্পদ।

ভারতের দারিদ্র্য

দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবাসী। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ)।

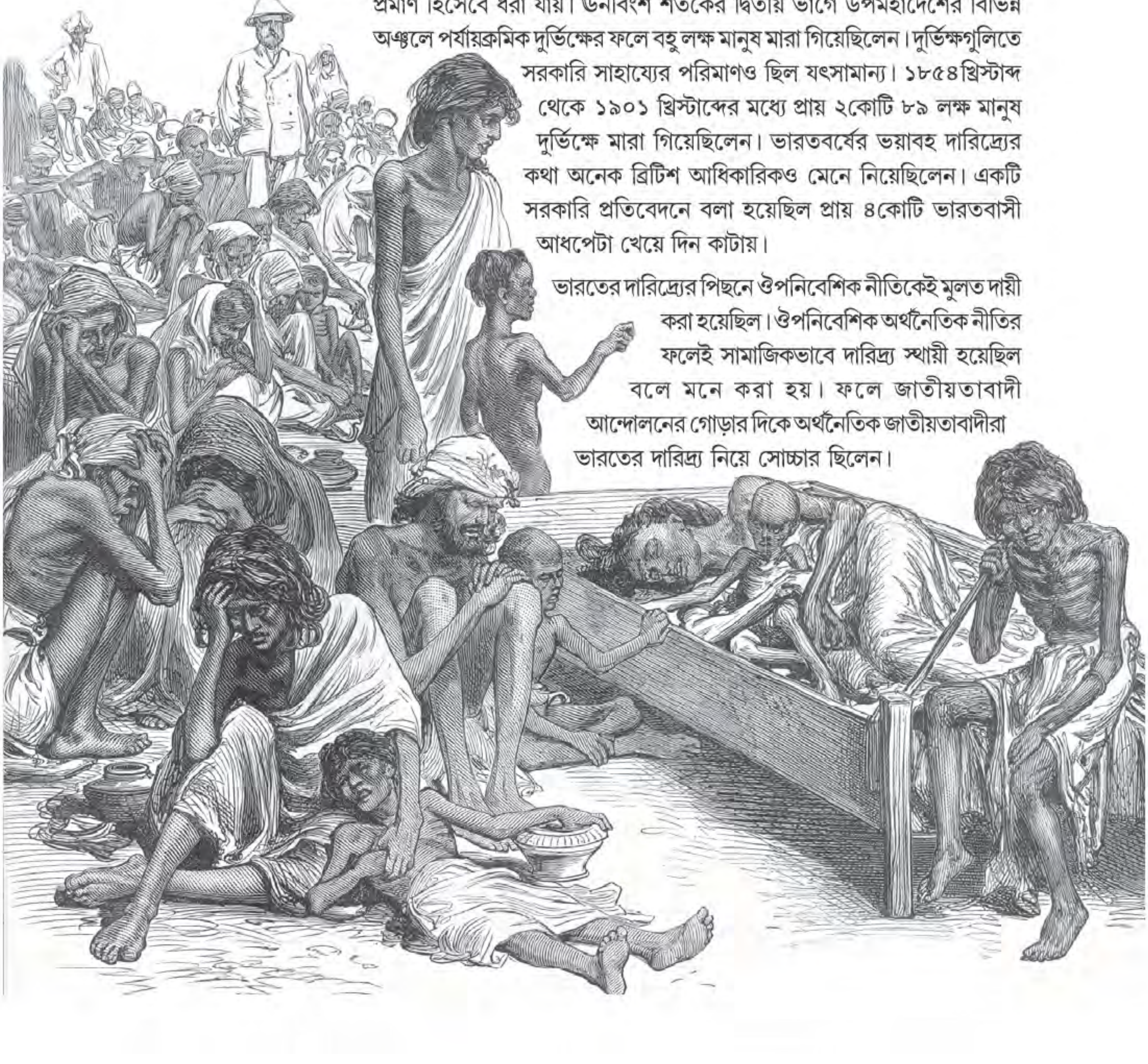

সম্পদের বহির্গমন ও অবশিল্পায়নের যৌথ ফলাফল হিসেবে ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বেড়েছিল। অবশ্য এই বিষয় নানান রকম মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণ বিচারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের দুর্ভিক্ষগুলি দারিদ্র্যের প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমিক দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষগুলিতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণও ছিল যৎসামান্য। ১৮৫৪খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা অনেক ব্রিটিশ আধিকারিকও মেনে নিয়েছিলেন। একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল প্রায় ৪কোটি ভারতবাসী আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়।

ভারতের দারিদ্র্যের পিছনে ঔপনিবেশিক নীতিকেই মুলত দায়ী করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতির ফলেই সামাজিকভাবে দারিদ্র্য স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের উন্নয়ন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে

"আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, ... এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। .... কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে— বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে।....

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, ... কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে— যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! .... তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

.... দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।.... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনও মঙ্গল নাই।"

[উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের সমসাময়িক)।

ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ ও বাগিচা ফসল-মানচিত্র

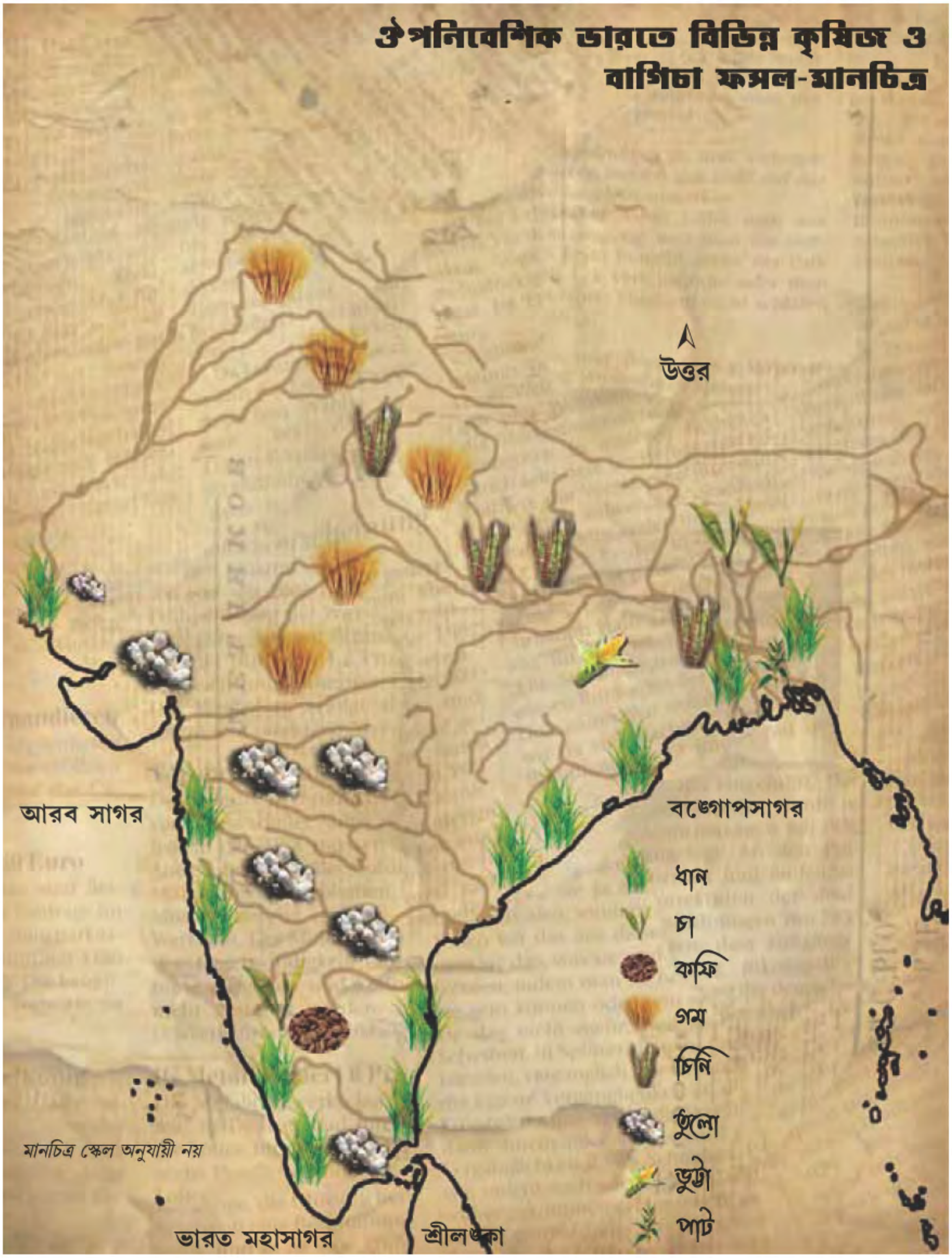

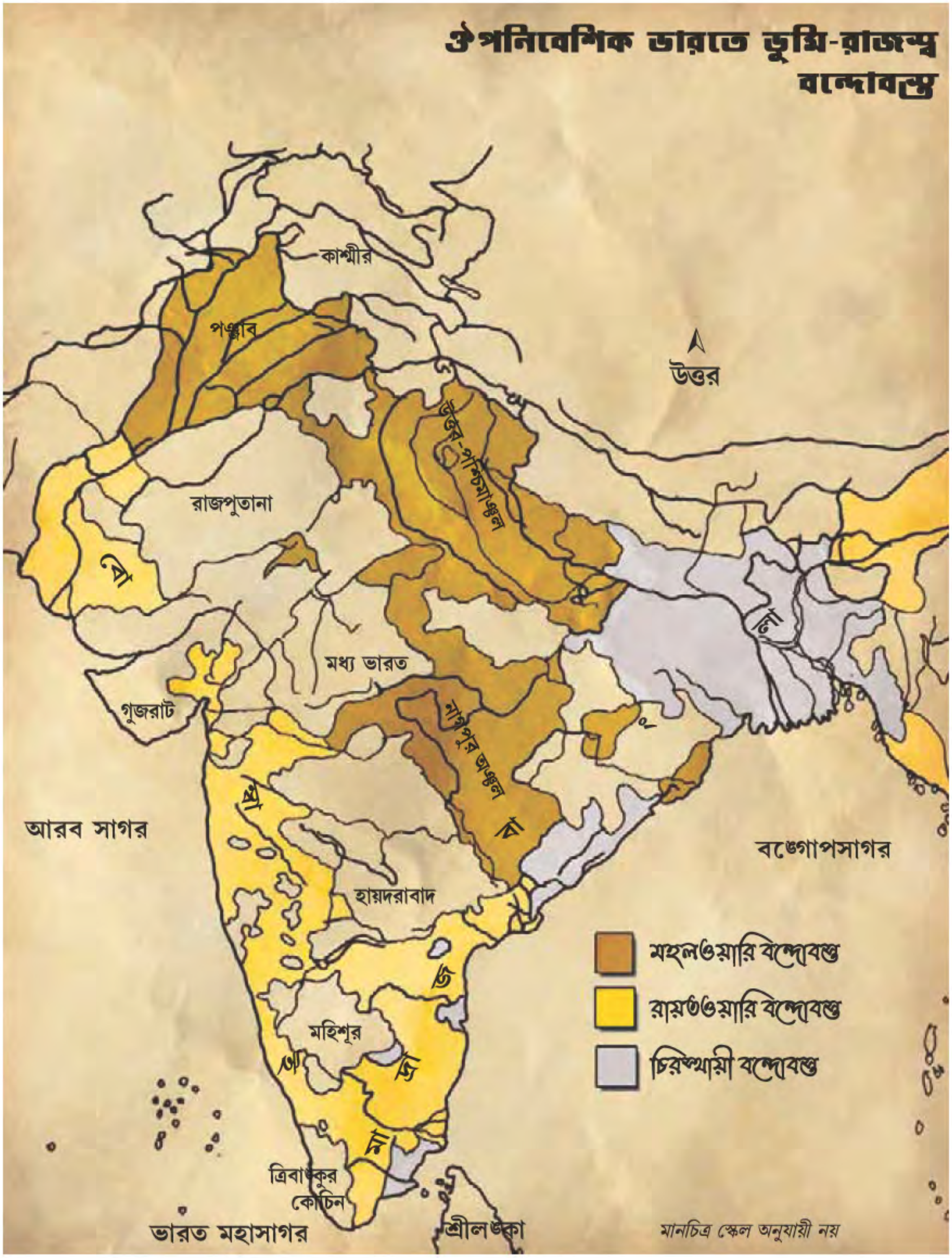
ঔপনিবেশিক ভারতে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত
কাশ্মীর
পঞ্জাব
উত্তর
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
রাজপুতানা
মধ্য ভারত
গুজরাট
নাগপুর অঞ্চল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
হায়দরাবাদ
মহলওয়ারি বন্দোবস্ত
রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
মহিশূর
ত্রিবাঙ্কুর
কোচিন
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন — (হেস্টিংস/ কর্নওয়ালিস/ ডালহৌসি)।

খ) মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল — (বাংলায়/ উত্তর ভারতে / দক্ষিণ ভারতে)।

গ) 'দাদন' বলতে বোঝায় — (অগ্রিম অর্থ/ আবওয়াব/ বেগার শ্রম)।

ঘ) ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম পাটের কারখানা চালু হয়েছিল — (রিষড়ায়/ কলকাতায়/ বোম্বাইতে)।

ঙ) দেশের সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়াকে বলে — (সম্পদের বহির্গমন/ অবশিল্পায়ন/ বর্গাদারি ব্যবস্থা)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়।

খ) নীল বিদ্রোহ হয়েছিল মাদ্রাজে।

গ) দাক্ষিণাত্যে তুলো চাষের সঙ্গে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বিষয় জড়িত ছিল।

ঘ) রেলপথের বিস্তারের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল।

ঙ) টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কোম্পানি-শাসনের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছিল।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০ - ৪০টি শব্দ) :

ক) 'সূর্যাস্ত আইন' কাকে বলে?

খ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝো?

গ) 'দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা' কেন হয়েছিল?

ঘ) সম্পদের বহির্গমন কাকে বলে?

ঙ) অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝো?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) বাংলার কৃষক সমাজের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়?

খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্ত গুলির তুলনামূলক আলোচনা করো। তিনটির মধ্যে কোনটি কৃষকদের জন্য কম ক্ষতিকারক বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দিয়ে লেখো।

গ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষক-অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কী সরাসরি সম্পর্ক ছিল? সেই নিরিখে 'দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা' কে তুমি কীভাবে বিচার করবে?

ঘ) বাংলার বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যনীতির কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? কেন দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি তৈরি করেন ভারতীয়রা?

ঙ) ভারতে কোম্পানি-শাসন বিস্তারের প্রেক্ষিতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো প্রথমবার তুমি রেলে চড়তে যাচ্ছ। রেলে চড়ার আগে এবং রেলে চড়ার পর তোমার অভিজ্ঞতা কেমন হয়েছে, তা বন্ধুকে চিঠি লিখে জানাও।

খ) ধরো তুমি ১৮৭০ -এর দশকে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের একজন বাসিন্দা। ঐ অঞ্চলের কৃষকদের তুলোচাষকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের বিবরণ তোমার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখো।

৫ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া : সহযোগিতা ও বিদ্রোহ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের যে সব উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে ভারতীয় সমাজের এক অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাহায্যে অনেক ভারতীয়ই সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এইসব ভারতীয়দের অধিকাংশ ব্রিটিশ কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরাজি শিক্ষার সুফল পেয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই কোম্পানির অর্থনৈতিক কার্যকলাপেও সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার ফলে উনবিংশ শতকের ভারতে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারকেরা সাধারণত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আদর্শের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনের সহগামী হিসেবেই দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব।

ঐ ভারতীয়রা মনে করতেন ইংরেজি ভাষা শিখতে পারলে তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে এবং চাকরি পেতে সুবিধা হবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কোম্পানিও বুঝতে পারছিল যে, শাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাতে সব সময় সুদূর ইংল্যান্ড থেকে লোক আনার খরচ অনেক বেশি। বরং ভারতীয়দের মধ্যে থেকে ঘষে-মেজে এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তোলা দরকার যারা রুচি ও মতের দিক থেকে ইংরেজ- অনুগামী হবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতীয়রা সবাই ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি সমান অনুগত ছিলেন না। সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের নানা বিষয়কে ঘিরে মাঝেমধ্যেই বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিত। এর পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনকে ঘিরে সরাসরি বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই বিক্ষোভগুলি প্রায়ই ছোটোবড়ো বিদ্রোহের আকার নিত। যদিও শিক্ষিত মানুষেরা অনেকসময় ঐ বিদ্রোহ-বিক্ষোভগুলির সমালোচনা করেছিলেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে যাঁরা মাঝামাঝি স্তরে থাকেন, সাধারণভাবে তাঁদেরকে *মধ্যবিত্ত* বলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চবর্ণের ঐ মধ্যবিত্তদের ব্রিটিশ-ভারতে *'ভদ্রলোক'* বলেও উল্লেখ করা হতো। এই নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো শহরকে কেন্দ্র করেই এই ভদ্রলোকদের সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলি গড়ে উঠেছিল।

ওল্ড কোর্ট হাউস ও রাইটার্স' বিল্ডিং, কলকাতা। মূল ছবিটি থমাস দানিয়েল-এর আঁকা (আনু. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন : সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন

প্রথম দিকের কোম্পানি শাসকরা ভারতীয় সমাজ বিষয়ে মূলত নিরপেক্ষ নীতি নিতেন। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। নৃশংস, অমানবিক কিছু রীতিনীতি বন্ধ করতে আইন প্রণীত হয়। তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইন জারি করা হলেও কুপ্রথাগুলি রয়েই গিয়েছিল। যেমন, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি সাগরে কন্যাশিশু ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে করে ঐ প্রথা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।

উনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ভারতীয়দের অনেকেই সমাজ সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হন। বাংলায় ঐ আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। যুক্তিসম্মত বিচারের সাহায্যে তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার কথা বলেছিলেন। তিনি মূর্তিপুজো, পুরোহিততন্ত্র এবং বহু ঈশ্বরবাদের নিন্দা করেন। সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণে তাঁর উদ্যোগ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকেও কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা বজায় ছিল। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। যদিও সতীপ্রথাকে নিয়ে নানানরকম গৌরবময় ধারণা সমাজে রয়েই গিয়েছিল। সম্পত্তিতে নারীর আইনগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও রামমোহন সওয়াল করেন।

HICKY's
BENGAL GAZETTE:
Calcutta General Advertiser.

সমাচার দর্পণ

টুকরো কথা

সংবাদপত্র ও জনমত গঠন

ভারতীয় জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্র-গুলির অবদান অপরিসীম। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ব্যবসায়ী জেমস অগাস্টাস হিকি *বেঙ্গল গেজেট* নামে প্রথম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবে সংবাদ পরিবেশনের ফলে হিকি কোম্পানি প্রশাসনের বিরাগ-ভাজন হন। শ্রীরামপুরের মিশনারি মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা *দিগদর্শন* ও সাপ্তাহিক পত্রিকা *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সতীদাহ প্রথা বিষয়ক একটি ছবি। মূল রঙিন ছবিটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

টুকরো কথা

সতীদাহ রদ বিষয়ে রামমোহনের সওয়াল

''প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যর্থাথ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ .... যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। .... সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, ... এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায়, যে সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—...... কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, ...।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?''

[উদ্ধৃত অংশটি রামমোহন রায়-এর 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' রচনা থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিধবা নারীদের পুনরায় বিয়ে দেওয়া নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে আইন জারি করে বিধবা বিবাহ চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন জারি করা হয়। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে মোটেই বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় হয়নি। বরং বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকটি বিধবা বিবাহ আয়োজন করা হয়েছিল।

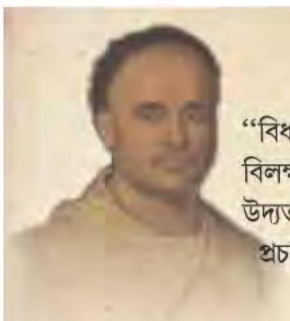

টুকরো কথা

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তি

''বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে তত দূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারে না; কিন্তু, এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ....

....

....বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনও ক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। অতএব, কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে সর্বপ্রকারেই কর্তব্য কর্ম, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।....''

[উদ্ধৃত অংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর 'বিধবা বিবাহ' রচনা (১৬ মাঘ, সংবৎ ১৯১১) থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বাংলায় শিক্ষা সংস্কার : ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষা

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের *নব্যবঙ্গ* বা *ইয়ং বেঙ্গল* গোষ্ঠী বলা হতো। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্যরা মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া জাতপাত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর পুরো সমর্থন ছিল। পরবর্তীকালে ঐ গোষ্ঠীর অনেক সদস্যই নিজেদের পুরোনো মতামত ও অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় প্রায় একক উদ্যোগে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সময় থেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত নানান সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পরিবারের ছেলেদের পাশাপাশি কায়স্থ ছেলেরাও সংস্কৃত কলেজে পড়ার সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষার দরকারও অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মাতৃভাষা ও ইংরেজির মধ্যে সংযোগসাধন দরকার। ১৮৫০-এর দশকে ছাত্রদের পড়ার জন্য অনেকগুলি বই লেখেন বিদ্যাসাগর। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় লেখা আধুনিক গণিতের চর্চাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি। সহকারি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি মডেল স্কুল তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। তিনি বুঝেছিলেন যে সরকারি তরফে যে সামান্য টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়, তা দিয়ে সমস্ত মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষা বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা উচিত বলে মনে করতেন বিদ্যাসাগর।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে আঁকা একটি ছবি। মূল ছবিটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আঁকা।

নারীদের শিক্ষাবিস্তারের প্রতিও বিদ্যাসাগর নজর দিয়েছিলেন। বেথুন স্কুলে যাতে মেয়েরা পড়তে যায় তার জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্কুল পরিদর্শকের কাজ করার সময় নিজের খরচে অনেকগুলি মেয়েদের স্কুল তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা সেই স্কুলগুলিতে অনেক মেয়েই পড়াশুনা করত।

ভারতের অন্যত্র সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

১৮৪০-এর দশক থেকে মহারাষ্ট্রে তথা পশ্চিম ভারতে বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের পক্ষে মতামত তৈরি হতে থাকে। ক্রমেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ দেখা যায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুশাস্ত্রী পন্ডিতের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের পক্ষে একটি সভা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আত্মারাম পান্ডুরং ও মহাদেব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

পণ্ডিতা রমাবাঈ

টুকরো কথা
নারীশিক্ষা ও পণ্ডিতা রমাবাঈ

উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নারীও উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে পশ্চিমভারতে পণ্ডিতা রমাবাঈ, মাদ্রাজে ভগিনী শুভলক্ষ্মী ও বাংলায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ব্রিটিশ প্রশাসন মেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন অনুদান ও বৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তার ফলে নারীশিক্ষার কিছুটা বিকাশ ঘটে।

পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল। সমস্ত সামাজিক বাধা নস্যাৎ করে তিনি এক শূদ্রকে বিয়ে করেন। পরে বিধবা অবস্থায় নিজের মেয়েকে নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে ডাক্তারি পড়েন রমাবাঈ। বিধবা মহিলাদের জন্য তিনি একটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। তবে রমাবাঈয়ের উদ্যোগকে রক্ষণশীলদের অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বীরেশলিঙ্গম পান্তুলুর নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়। পান্তুলু বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মূর্তিপুজো, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরোধিতা করেছিলেন বীরেশলিঙ্গম। পাশাপাশি নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষেও সওয়ান করেন পান্তুলু। তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রার্থনা সমাজের সংস্কার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে শিক্ষিত নাগরিকদের অনেকেই ঐ আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও সামান্য কয়েকটি বিধবা বিবাহ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বোম্বাইয়ের একটি মেয়েদের স্কুল। মূল ছবিটি উইলিয়ম সিম্পসন-এর আঁকা (আনু. ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।

ধর্ম সংস্কার : ব্রাহ্ম আন্দোলন ও হিন্দু পুনরুজ্জীবন

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন রায়। মূলত সামাজিক সংস্কার করাই ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে ওঠে। রামমোহনের পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। ১৮৬০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির উদ্যোগে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের গন্ডি পেরিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয় ঐতিহ্য এবং ব্রাহ্ম ধারণার মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু আদতে সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলন সীমিত ছিল। ফলে ধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি উগ্র নব্যহিন্দু ধর্মপ্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

টুকরো কথা
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজ

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদকে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে চূড়ান্ত বলে মনে করতেন দয়ানন্দ। তার মতে বেদের মধ্যেই নাকি সমস্ত বিজ্ঞানের কথা নিহিত রয়েছে। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত আচার ও সংস্কার মিশে গিয়েছিল সেগুলির সমালোচনা করেন দয়ানন্দ। মূর্তিপুজো, পুরোহিতদের প্রাধান্য ও বাল্যবিবাহের মতো বিষয়গুলি দয়ানন্দের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল। পাশাপাশি বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সমাজ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু দয়ানন্দের মৃত্যুর পর আর্য সমাজ আন্দোলন উগ্র হিন্দু রূপ ধারণ করতে থাকে।

বাংলায় ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের ছাপ দেখা যায়। রাজনারায়ণ বসুর *জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা* এবং নবগোপাল মিত্রে *জাতীয় মেলা* এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। জাতীয় মেলা পরে *হিন্দুমেলা* নামে পরিচিত হয়। হিন্দুধর্মের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে সকলকে উজ্জীবিত করাই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। উনিশ শতকের চাকরিজীবী শহুরে শিক্ষিত মানুষের কাছে রামকৃষ্ণের এক বিশেষ আবেদন তৈরি হয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সহজভাবে ও ভাষায় ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ নারীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সংস্কার আন্দোলনগুলির চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা

উনিশ শতকের এইসব সামাজিক সংস্কারগুলি গোড়া থেকেই সংকীর্ণ সীমানায় আটকা পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আর্থিক ও শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধাগুলি মূলত উচ্চবর্গের ভদ্রলোক ব্যক্তিরাই পেয়েছিলেন।

টুকরো কথা
জ্যোতিরাও ফুলে

মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জ্যোতিরাও ফুলে ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী বাঈ-এর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁরা লড়াই করেছিলেন। পুনা শহরে তাঁরা ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে নারীশিক্ষা প্রসারে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। জ্যোতিরাও ফুলের '*সত্যশোধক সমাজ*' নীচুতলার মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করত। তবে জ্যোতিরাও ফুলের উদ্যোগ সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিশেষ সফল হয়নি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশবচন্দ্র সেন

এই ভদ্রলোকেরাই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো সংস্কার আন্দোলনগুলির পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়লেও সমাজের সাধারণ জনগণের সঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তাছাড়া সংস্কারকরাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন বাংলার সমাজ সংস্কারকরা। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও প্রার্থনা সমাজের সামাজিক ভিত্তি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে আটকে ছিল। পাশাপাশি এই সংস্কার আন্দোলনগুলি জাতিভেদ নিয়ে বিশেষ সোচ্চার হয়নি। কারণ সংস্কারকদের অধিকাংশই উঁচু জাতির প্রতিনিধি ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করতেন যে, ধর্মশাস্ত্রে যে সব আচরণের কথা বলা আছে সেগুলি পালনীয়। তাঁরা মনে করতেন কিছু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মশাস্ত্রগুলির অপব্যাখ্যা করে। দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ সেসব শাস্ত্র কখনও পড়েনি। ফলে শাস্ত্রের নামে বিভিন্ন কুপ্রথার শিকার হতো তারা। এই মনোভাবের ফলে সমাজ সংস্কারকরা বিভিন্ন শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নেন। সতীদাহ বন্ধের ও বিধবা বিবাহ চালুর পক্ষে আন্দোলনগুলি গোড়া থেকেই ছিল শাস্ত্র-নির্ভর। রামমোহন রায় বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে নজির দিয়ে সতীদাহের বিপক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে তুলে ধরেছিলেন। বিভিন্ন প্রথার নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার বদলে ঐ প্রথাগুলি শাস্ত্রসম্মত কি না, তা নিয়ে আলোচনায় বেশি জোর পড়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস
ও
স্বামী বিবেকানন্দ

মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রক্রিয়া : আলিগড় আন্দোলন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় *মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি* প্রতিষ্ঠা তারই প্রমাণ। মুসলমান সংস্কারকদের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন সবথেকে অগ্রগণ্য। চাকরির সুবাদে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্যর সৈয়দ। ফলে মুসলমান সমাজেও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় করার জন্য উদ্যোগ নেন তিনি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হতে থাকে। আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে কোরানকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ। পুরোনো প্রথা ও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিলেন তিনি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ* প্রতিষ্ঠা করেন স্যর সৈয়দ। মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের পাশাপাশি বেশ কিছু হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক ঐ কলেজে পড়াশুনার চর্চা করতেন।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে সাক্ষরতার হার কেমন? কী কী ব্যবস্থা নিলে তোমার অঞ্চলে সাক্ষরতার প্রসার হবে, তা নিয়ে স্কুলে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

তবে মুসলমান সমাজে সবাই স্যর সৈয়দের সংস্কারগুলি সমর্থন করেনি। পাশাপাশি স্যর সৈয়দ আহমদের সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি সীমিত চরিত্রের ছিল। বিরাট সংখ্যক গরিব মুসলমানদের উপর ঐসব সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়েনি। মূলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানরাই ঐ সংস্কারগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষক ও উপজাতি সমাজের বিদ্রোহ

আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রশাসন ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নানারকম রদবদল করেছিল। সেই পরিবর্তনগুলির সরাসরি প্রভাব কৃষক ও উপজাতি সমাজের উপর পড়েছিল। তার ফলে আঠারো শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক ও উপজাতি মানুষজন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

পাশাপাশি কৃষক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা একজোট হয়ে স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। যদিও ব্রিটিশ প্রশাসনের ও অনেক ভদ্রলোকের চোখে ঐ আন্দোলন ও বিদ্রোহগুলি নিছক 'আইন শৃঙ্খলার সমস্যা' বলে মনে হতো। উপজাতি-বিদ্রোহগুলিকে 'অসভ্য আদিম মানুষদের বিদ্রোহ' বলে খাটো করা হতো। কিন্তু বাস্তবে ঐ সব বিদ্রোহগুলি ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের উদাহরণ।

প্রতিবাদী ভারতবাসী। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-'৫৬ খ্রিঃ)

ঔপনিবেশিক শাসক, জমিদার, ইজারাদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজাতিরা বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৫৫-'৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালদের এলাকায় জমিদার, বহিরাগত মহাজন (যাদের দিকু বলা হতো) প্রভাব বিস্তার করে। দরিদ্র সাঁওতালরা দিকুদের অত্যাচারের মুখে পড়ে। ইউরোপীয় কর্মচারীরা সাঁওতালদের জোর করে রেলপথ তৈরির কাজে লাগাত এবং অত্যাচার করত। সবচেয়ে বড়ো কথা সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হচ্ছিল।

এই ভয়াবহ জীবন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রথমদিকে সাঁওতালরা মহাজন, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি-কুঠি আক্রমণ করেছিল। পরে সাঁওতালরা তাদের বিদ্রোহ (হুল) সংগঠিত করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সিধু, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব।

ভাগলপুর থেকে রাজমহল এলাকায় বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন নির্মমভাবে সাঁওতালদের আক্রমণ করে। সিধু ও কানহুসহ হাজার হাজার সাঁওতালদের হত্যা করা হয়েছিল। তবে এই বিদ্রোহ পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়নি। ব্রিটিশ প্রশাসন উপজাতিদের স্বার্থ ও সুরক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সাঁওতালদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল সাঁওতাল পরগনা।

টুকরো কথা

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট

সাঁওতাল বিদ্রোহের খবর কলকাতায় পৌঁছানোর পরে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিদের অনেকেই ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসনের দমন-পীড়নের বিরোধিতাও তাঁরা করেননি। এর অন্যতম ব্যতিক্রম ছিলেন *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* সংবাদপত্রের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক শোষণই সাঁওতালদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। তাঁর পত্রিকায় হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন, শান্ত ও সৎ সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহ করার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। শোনা গিয়েছে যে, সাঁওতালদের জোর করে বেগার খাটানো হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত খাজনা দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। হরিশচন্দ্র বলেন, যারা শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের উপর অত্যাচার করে তাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছে, তাদেরই শাস্তি হওয়া উচিৎ। সাঁওতালদের শাস্তি প্রাপ্য নয়। সাঁওতালরা শুধু চায় নিজেদের জঙ্গল ও উপত্যকার মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার।

টুকরো কথা

মালাবারের মোপালা বিদ্রোহ

দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে কৃষকেরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম মোপালা বিদ্রোহ। মোপালাদের অনেকেই ছিলেন কৃষি শ্রমিক, ছোটো ব্যবসায়ী ও জেলে। ব্রিটিশরা মালাবার দখল করার পর সেখানের গরিব কৃষকদের ওপর রাজস্বের বোঝা ও বিভিন্ন বেআইনি কর চাপিয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি জমিতে কৃষকদের অধিকারও অস্বীকার করা হয়। এসবের ফলে মালাবার অঞ্চলে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহগুলি দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রশাসন সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করেছিল।

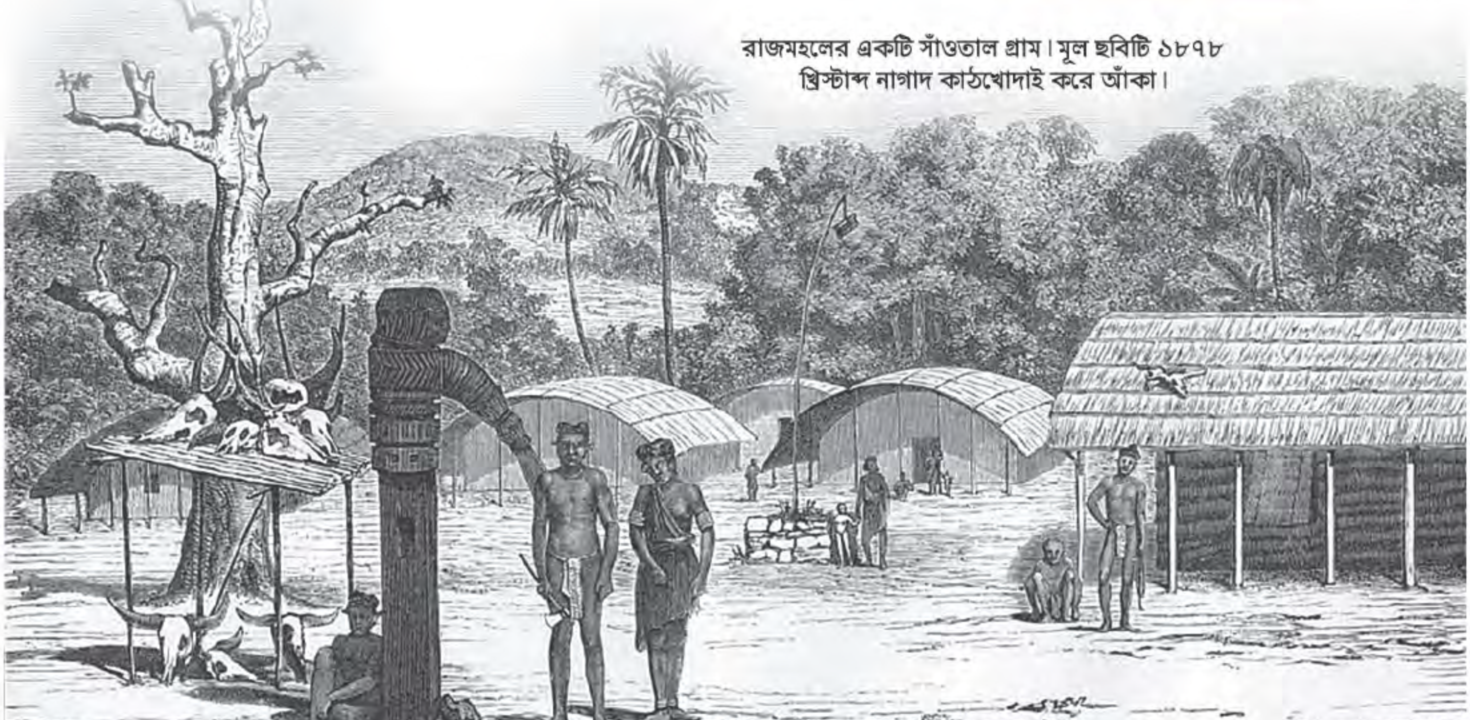

রাজমহলের একটি সাঁওতাল গ্রাম। মূল ছবিটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কাঠখোদাই করে আঁকা।

ওয়াহাবি আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা হয় আরবে, আব্দুল ওয়াহাব-এর নেতৃত্বে। ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচলানা করেন রায়বেরিলি অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ নামের এক ব্যক্তি। তিনি ওয়াহাবিদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ করেন। বারাসাত অঞ্চলের মির নিসার আলি (তিতুমির) ওয়াহাবি মতামতে অনুপ্রাণিত হন। তিতুমিরের নেতৃত্বেই নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলে ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হয়। নদিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও ওয়াহাবি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

তিতুমিরের আন্দোলন স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। বিদ্রোহ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তিতুমির ঘোষণা করেন কোম্পানি সরকারের শাসন শেষ হয়ে আসছে। বারাসাত অঞ্চলে একটি বাঁশের কেল্লা বানিয়ে নিজে বাদশাহ উপাধি নেন তিতু। নারকেলবেড়িয়া বা বারাসাত বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ-বাহিনী কামান দেগে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে দেয় (১৮৩১ খ্রি:)।

নীল বিদ্রোহ

১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নীল চাষ ও নীলকরদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহের দু-জন নেতা ছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। নীল বিদ্রোহের পক্ষে বাংলার শিক্ষিত জনগণের অনেকেই নানাভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র *নীলদর্পণ* নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারি রেভারেন্ড জেমস লং নীল বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* ও *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা নীলচাষিদের পক্ষে দাঁড়ায়। এসবের ফলে নীলকরদের উপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নীল বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়। পাশাপাশি বাংলা থেকে নীল চাষও ততদিনে প্রায় উঠে গিয়েছিল।

টুকরো কথা
নীল বিদ্রোহ ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট

বাংলার নীল বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু প্যাট্রিয়ট সংবাদপত্র ও তার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহমর্মী অবস্থান নিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষিদের পক্ষ নিয়ে লেখা শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তিন শিশির কুমার ঘোষ ও মনমোহন ঘোষকে নিয়োগ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র লেখেন যে, বাংলায় নীলচাষ একটি সংগঠিত জুয়াচুরি ও নিপীড়ন-ব্যবস্থা মাত্র। হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে, নীল চাষে চাষির লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি। যে চাষি একবার নীল চাষ করেছে, তার আর বেঁচে থাকতে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। কোনো চাষি নীলকরের বিরোধিতা করলে, তাকে অত্যাচারিত হতে হয়। নীলকর কোনো নীলচাষিকেই ন্যায্য দাম দেয় না। বস্তুত, হরিশচন্দ্রের উদ্যোগেই নীল বিদ্রোহের খবরাখবর বাংলায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা
ফরাজি আন্দোলন

পূর্ববাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে হাজি শরিয়তউল্লা গরিব চাষিদের নিয়ে ফরাজি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফরাজি মতামতের প্রসারের ফলে স্থানীয় জমিদারেরা ভয় পেয়েছিল। বারাসাত বিদ্রোহের মতোই ফরাজি আন্দোলনেও জমিদার, নীলকর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। ফরাজি আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত চলেছিল।

মুন্ডা উলগুলান

উপজাতীয় কৃষক বিদ্রোহে অন্যতম বড়ো উদাহরণ ছিল বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রি:)। মুন্ডাদের জমি ধীরে ধীরে বহিরাগত বা দিকুদের হাতে চলে যায়। পাশাপাশি জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারি ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি মুন্ডা কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। মুন্ডারা বিশ্বাস করত তাদের নেতা বিরসা নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিরসার আন্দোলন কেবল দিকুদের বিতাড়নেই থেমে থাকেনি। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিরসার শাসন প্রতিষ্ঠা করা মুন্ডা উলগুলানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দমন-পীড়নের ফলে মুন্ডা উলগুলান পরাস্ত হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ কোম্পানি কিভাবে সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ নং পৃষ্ঠা দেখো)। সেই সময় থেকেই সেনাবাহিনীতে নানান রকম জাতিপরিচয়কে উশকে দিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ১৮২০-র দশক থেকে ক্রমশ সেনাবাহিনীতে নানান রকম সংস্কার করা হতে থাকে। তার ফলে জাতিগত সুযোগ-সুবিধার বদলে সমস্ত সেনা বাহিনীকে একই ছাঁচে ঢালার চেষ্টা হতে থাকে। তার ফলে সেই সময় থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে বিরোধিতা শুরু হয়।

ঐ অসন্তোষের পটভূমির মধ্যে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ঐ বছরের গোড়ার দিকে কলকাতার দমদম সেনাছাউনির সিপাহিদের মধ্যে বন্দুকের টোটা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে যায়। বলা হতে থাকে যে, নতুন এনফিল্ড রাইফেলের টোটাগুলিতে নাকি গোরু ও শূকরের চর্বি মেশানো রয়েছে। ঐ টোটাগুলি রাইফেলে ভরার আগে দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হতো। তার ফলে সিপাহিদের মনে বিশ্বাস তৈরি হয় যে, কোম্পানি ষড়যন্ত্র করে তাদের জাত ও ধর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করছে। যদিও ঐ গুজবটি খানিকটা ঠিকই ছিল। দ্রুতই সারাদেশের সেনাছাউনিতে গুজবটি ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি ঐ টোটা বানানো বন্ধ করে দেয়। সিপাহিদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কোম্পানি-শাসনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করা হয়।

মিরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহ। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)।

কিন্তু সিপাহিদের বিশ্বাস যে ভেঙে গিয়েছিল, তার প্রমাণ খুব তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্যারাকপুরের সেনাছাউনিতে সিপাহি মঙ্গল পান্ডে এক ইউরোপীয় সেনা আধিকারিককে গুলি করেন। মঙ্গলের সহকর্মীরা কর্তৃপক্ষের আদেশ পেয়েও মঙ্গলকে গ্রেফতার করেননি। দ্রুতই তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করে ফাঁসির বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এর পর থেকে দেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ ফুটে বেরোতে থাকে। আম্বালা, লখনৌ, মিরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানারকম গোলযোগের খবর পাওয়া যায়। মে মাসের মাঝামাঝি মিরাটের সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় কোম্পানির বিরুদ্ধে সিপাহিবাহিনীর বিদ্রোহ।

টুকরো কথা

গোরে আয়ে

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে। বিকাল তখন শেষ হয়ে আসছে। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের সেনাছাউনির কাছে বাজারে বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিপাহিরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। আগের দিন কলোনেল কারমাইকেল স্মিথ ৮৫ জন সিপাহিকে জেলে আটক করেছেন। সাধারণ অপরাধীদের মতোই তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ ব্যবহার করতে চায়নি। এইসব আলোচনাতেই ব্যস্ত ছিল সিপাহিরা। ঐ সময়ে কোম্পানির সেনাছাউনির শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা প্যারেড করে সন্ধের সময় চার্চে প্রার্থনার জন্য যাচ্ছিল। অনেকে বলেন তাদেরকে দেখে নাকি সেনা ক্যান্টিনের এক অল্পবয়স্ক ছেলে বাজারের দিকে 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে একটি ভুল খবর দিয়েছিল। ভুল খবরটি এই যে, ঐ বিদেশি সৈনিকরা দেশীয় সিপাহিদের বন্দি করতে আসছে। উত্তেজিত সিপাহিরা ছুটল সেনাছাউনির দিকে। দখল নিল সেনাছাউনির অস্ত্রাগারের। তাদের সঙ্গে যোগ দিল স্থানীয় মানুষ। আবার এমন অনেক লোকও যোগ দিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল লুঠপাট করা। একে একে গোরা সৈন্যদের হত্যা করা হলো। মিরাটে শুরু হলো সিপাহি বিদ্রোহ।

লখনৌ-এর ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে রেসিডেন্সিটি সিপাহিরা আক্রমণ করেছিল। মূল ফটোগ্রাফটি রবার্ট ও হ্যারিয়েট টাইটলার-এর তোলা।

মিরাটের সিপাহিরা প্রথমে তাদের বন্দি সহকর্মীদের মুক্ত করে। তারপরে ইউরোপীয় সেনা আধিকারিকদের মেরে ফেলে সম্মিলিতভবে দিল্লির দিকে রওনা দেয়। দিল্লি পৌঁছে সিপাহিরা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে *হিন্দুস্থানের সম্রাট* হিসেবে ঘোষণা করে। ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার বিভিন্ন সেনাছাউনিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। অনেক জায়গাতেই বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু অভিজাত ও সাধারণ জনগণ একজোট হয়েছিল। ফলে দ্রুতই সিপাহিদের বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল।

তবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ব্রিটিশ কোম্পানির সমস্ত সিপাহিবাহিনী এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীর সিপাহিরা বিদ্রোহ থেকে সরে ছিল। অন্যদিকে পঞ্জাবি ও গুর্খা সিপাহিরা কার্যত বিদ্রোহী সিপাহিদের দমন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছিল। প্রধানত বেঙ্গল আর্মির সিপাহিরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আসলে বেঙ্গল আর্মির মধ্যেই বেশিরভাগ ভারতীয় সিপাহি ছিল। অর্থাৎ কোম্পানির অধীনে মোট সিপাহির প্রায় অর্ধেকই ছিল বেঙ্গল আর্মিতে। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় সিপাহিবাহিনীর প্রায় অর্ধেক অংশই কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

বেঙ্গল আর্মির বেশিরভাগ সিপাহি আদতে অযোধ্যার বাসিন্দা ছিল। অযোধ্যার প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার থেকেই কেউ না কেউ সিপাহি হিসেবে সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কোম্পানির তরফে যে সব সংস্কার সিপাহিবাহিনীতে করা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে অযোধ্যাবাসী সিপাহিদের অভিযোগ ছিল। তাদের বেতন কমে যাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছিল। তাছাড়া ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ঘোষণা করে যে, সিপাহিদের নিজের নিজের অঞ্চলের বাইরে গিয়েও কাজ করতে হবে। কিন্তু সে বাবদ আলাদা কোনো ভাতা সিপাহিরা পাবে না। এদিকে কোম্পানি শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে যত ছড়িয়ে পড়তে

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহিদের হাতে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সেনাআধিকারিকের মৃত্যু। মূল ছবিটি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

নানা সাহেব

থাকে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহিদের পাঠানোর প্রয়োজন হয়। এমনকি যেসব সিপাহিরা যেতে অরাজি হতো তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতো। চাকরি সংক্রান্ত এইসব সংঘাতের সঙ্গে এনফিল্ড রাইফেলের টোটা বিষয়ক গুজবটি মিশে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে কোম্পানি বিষয়ে সন্দেহ ও ভয় দানা বেঁধেছিল।

বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে অসামরিক সাধারণ জনগণ অনেক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। তবে যেসব অঞ্চলের মানুষজন ব্রিটিশ শাসনের সুফল ভোগ করত তারা এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়নি। বাংলা ও পঞ্জাব ছিল সেরকম দুটি অঞ্চল। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই বিদ্রোহকে নিন্দা করেছিল।

টুকরো কথা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ : এক বাঙালি সরকারি চাকুরের চোখে

"...... দূরস্থ একদল সৈন্য হল্লা করিয়া উঠিল। "ভাই! খবরদার! ভাই! খবরদার!! গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" ইহার অর্থ এইরূপ — "ইংরেজসৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, খুব সতর্ক হও।"

এইবার সকলের মুখ হইতেই শুনিতে পাওয়া গেল, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" তখন আর কাহারও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। সকলেই বিভীষিকা-গ্রস্ত হইয়া যেন হাত পা হারা হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে" শব্দে যেন আকাশ, পাতাল, পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে তাহার কিছুই স্থির মীমাংসা দেখিলাম না। কেবল দেখিতে লাগিলাম, রণবংশীর স্বর শুনিয়া সৈন্যগণ দলে দলে প্যারেড ভূমির দিকে দৌড়িতেছে,....।

গোরা অর্থাৎ ইংরেজ-সৈন্য আসিয়াছে শুনিয়া আমার মনে অতুল আনন্দ হইল।.... ইংরেজ-আগমনের শুভবার্তা শুনিয়া মনে মনে কতই সুখের কথা কল্পনা-জল্পনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ খবর পাইলাম, ইংরেজ আইসে নাই — গোরা আক্রমণ করে নাই; সিপাহীগণের উহা কাল্পনিক ভয় মাত্র।....

....

.... অদ্য ১৮৫৭ সালের ১লা জুন সোমবার বেরিলির সিপাহী বিদ্রোহের একদিবস অতীত হইল — দ্বিতীয় দিবস আসিল।"

[উদ্ধৃত অংশটি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *বিদ্রোহে বাঙ্গালী* গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় রেলপথে সেনা পাঠানোর একটি ছবি। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)।

প্রায় পুরো দক্ষিণ ভারতই এই বিদ্রোহের আওতার বাইরে ছিল। অসামরিক সাধারণ জনগণ যারা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে মূলত দু-ধরনের মানুষের প্রাধান্য ছিল। বেশ কিছু সামন্তপ্রভু ও জমিদার ব্রিটিশ কোম্পানির বিভিন্ন নীতির ফলে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হারিয়েছিল। যেমন লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে অনেক আঞ্চলিক রাজ্য কোম্পানি-শাসনের আওতায় চলে গিয়েছিল। ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায় কোম্পানি-বিরোধী অবস্থান থেকে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরেই কোম্পানি-প্রশাসনের রাজস্ব-নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছিল। ফলে রাজস্বের বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে তারা ঔপনিবেশিক-শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। উঁচু হারে রাজস্ব শোধ করতে গিয়ে অনেক কৃষকই মহাজনি দেনায় আটকা পড়তে থাকে। তার ফলে কৃষকদের হাত থেকে জমি বেরিয়ে যায়। সেকারণেই বিদ্রোহী কৃষকেরা ব্রিটিশ কোম্পানির পাশাপাশি স্থানীয় মহাজনদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিল। হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে কৃষক ও জমিদাররা কোম্পানির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। পাশাপাশি, বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য অটুট ছিল। বস্তুত, কোনো একটি কারণের ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ হয়নি। বিভিন্ন অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটি বড়ো গণঅভ্যুত্থানের চেহারা পেয়েছিল।

নিজে করো

ঔপনিবেশিকশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহগুলির বিষয়ে একটি চার্ট বানাও। চার্টে বিদ্রোহগুলির ছোটো ছোটো ইতিহাস ও লিখে রাখো।

টুকরো কথা

সিপাহি বিদ্রোহ না জাতীয় বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে বিদ্রোহের শুরু থেকে বিতর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ ব্রিটিশ ভাষ্যকারের মতে ঐ বিদ্রোহ কেবল সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ জনগণ নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশের জন্য ঐ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়েছিল মাত্র। কিন্তু বিদ্রোহের সময়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছিল যে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কি নিছক সেনা বিদ্রোহ? না কি তা ক্রমেই '*জাতীয় বিদ্রোহ*'-এর রূপ নিচ্ছে? বিদ্রোহের সময়ই একটি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, যাকে সেনাবিদ্রোহ মনে করা হচ্ছে, তা আদতে '*জাতীয় বিদ্রোহ*'।

ধীরে ধীরে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা '*ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ*' বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে খানিক বাড়তি আবেগ ছিল। কারণ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের কোনো ধারণা ছিল না। বরং বিদ্রোহী নেতৃত্বের অনেকেই একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্রোহীরা পুরোনো মুঘল শাসন ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আবার কেবল সিপাহি বিদ্রোহ বললেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না।

ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনীর লখনৌ পুনর্দখল। মূল ছবিটি থমাস জোনস বার্কার-এর আঁকা।

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। মূল ছবিটি অগস্ত সোয়েস্ট-এর আঁকা।

একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছিল যে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ-শাসনে তাদের 'দীন' (বিশ্বাস) ও 'ধরম' (ধর্ম) নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সব বিদ্রোহীরা একে অন্যকে মুখোমুখিভাবে না চিনলেও, বিদেশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। পাশাপাশি পুরোনো মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যও বিদ্রোহীদের ছিল না। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্রোহীরা মুঘল কর্তৃত্বকে স্বীকার করতেন।

অনেক জায়গাতেই সামন্তপ্রভু ও জমিদাররা বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে পড়লেও, সমস্ত ক্ষেত্রে তারাই শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং অনেক সামন্তপ্রভু ও জমিদারই খানিক পরিস্থিতির চাপে জনগণের বিদ্রোহে যোগ দেন। এমনকি বাহাদুর শাহ জাফর নিজেও বিদ্রোহীদের তরফে নেতৃত্বের প্রস্তাব পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ও নানা সাহেবকেও খানিক জোর করেই সিপাহিরা বিদ্রোহে টেনে এনেছিল। ফলে সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের অংশগ্রহণের উপর ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নির্ভরশীল ছিল না। প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সভা করে কর্তব্য ঠিক করতো। তারপর একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চাপাটি (রুটি) পাঠানোর মধ্যে দিয়ে খবরাখবর আদানপ্রদান করা হতো।

ব্রিটিশ কোম্পানি অবশ্য চূড়ান্ত দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে দিল্লি পুনরায় অধিকার করে নেয় কোম্পানির সেনাবাহিনী। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়।

বিদ্রোহী সিপাহিদের শাস্তি দেওয়ার একটি দৃশ্য।

টুকরো কথা
বাহাদুর শাহ জাফর-এর বিচার

মুঘল বাদশাহর লালকেল্লার দেওয়ান-ই খাসে বসে শাসন চালাতেন। সেখানেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর-এর বিচারের জন্য আদালত বসে। বিচারের আগে দেওয়ান-ই খাসের বাইরে ৮২ বছরের বৃদ্ধ সম্রাটকে প্রায় দেড়ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তারপর তাঁকে ভেতরে ডেকে একটি সাধারণ আসনে বসতে দিয়ে শুরু হয় বিচার। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিচার চলার মধ্যে সাক্ষিদের জেরা করার সুযোগও মুঘল সম্রাটকে দেওয়া হয়নি। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বৃদ্ধ সম্রাটকে দোষী ঘোষণা করে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়।

কিন্তু সমস্ত দমন-পীড়ন সত্ত্বেও বিদ্রোহ থেমে যায়নি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সেনারা উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহীদের হারিয়ে দেয়। বস্তুত, ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা অসম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের না ছিল যথেষ্ট সম্পদ, না ছিল যথেষ্ট লোকবল। তাছাড়া তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ছিল না। তার উপরে বিদ্রোহীরা প্রায় সকলে দিল্লিতে জড়ো হওয়ার ফলে বেশি দূর বিদ্রোহ ছড়াতে পারেনি। কার্যত দিল্লি পুনর্দখল করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি বিদ্রোহের অনেকটাই দমন করে ফেলেছিল।

নিজে করো

"তিনি পুরুষের মতো পোশাক পরতেন। মাথায় পাগড়ি। তিনি পুরুষের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়তেন। মুখশ্রী সাধারণ – গুটিবসন্তের দাগ, কিন্তু সুন্দর চেহারা এবং টিকালো নাক। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল বুদ্ধির ছাপ। তিনি খুব একটা ফর্সা ছিলেন না। তিনি সোনার নুপুর ও ... নেকলেস পরতেন। তিনি মসলিন পরতেন।"

উপরের বর্ণনাটি রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের। লর্ড ক্যানিং, যিনি মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, রানির এই বর্ণনা লিখে রেখেছিলেন। বর্ণনাটি থেকে ঝাঁসির রানির বিষয়ে তুমি কী জানতে পারো?

বাহাদুর শাহ জাফর ও তাঁর পুত্রদের বন্দি করার দৃশ্য। মূল ছবিটি উইলিয়ম হজসন-এর আঁকা।

ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া

টুকরো কথা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ : কলকাতার অভিজ্ঞতা

"১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খৃষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর-জেনেরাল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন — কালাদের অস্ত্র শস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ... আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র-সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটী জিনিষের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুইচারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes there?)। তাহা হইলেই বলিতে হইত, "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।"

[উদ্ধৃত অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রী-র *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অভিঘাতে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন লোপ পেয়েছিল। তার বদলে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সরাসরি ভারতের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। আইন জারি করে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের *সম্রাজ্ঞী* ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি রানির মন্ত্রীসভার একজন সদস্যকে ভারত-শাসন বিষয়ে দেখভালের জন্য *সচিব* হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল পদটি তুলে দেওয়া হয়। তার জায়গায় রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় পদ তৈরি করা হয়। লর্ড ক্যানিং যিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, তিনি প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর থেকে ভারত শাসন সংক্রান্ত ঐ আইনটি বলবৎ হয়। ভারতে শুরু হয় রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন।

রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ভারতে জারি করা একটি মোহর।

ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী গণআন্দোলন
(ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ)
উত্তর
মিরাট
দিল্লি
বেরেলি
লখনৌ
ফৈজাবাদ
কানপুর
গোয়ালিয়র
আরা
ঝাঁসি
কোল
জবলপুর
সন্ন্যাসী-ফকির
ওয়াহাবি
ফরাজি
ব্যারাকপুর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
পলিগার
ভেলোর
কিত্থিপুরা
মাপিলা
ত্রিবাঙ্কুর
তিরুনেলভেলি
শ্রীলঙ্কা
ভারত মহাসাগর
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়
১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র
যে ১৮৫৭-র পূর্বে সিপাহি অভ্যুত্থান
১৮৫৭-র পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ
১৮৫৭-র পূর্বে ধর্ম-কেন্দ্রিক কৃষক বিদ্রোহ
১৮৫৭-র পূর্বে অন্যান্য বিদ্রোহ

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
হিন্দু প্যাট্রিয়ট	শেষ মুঘল সম্রাট
বাহাদুর শাহ জাফর	সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন
রাজা রামমোহন রায়	ব্রাহ্ম সমাজ
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	সিধু ও কানহু
সাঁওতাল বিদ্রোহ	নীল বিদ্রোহ

২। **বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :**

ক) পণ্ডিতা রমাবাঈ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ভগিনী শুভলক্ষ্মী, রানী লক্ষ্মীবাঈ।

খ) আত্মারাম পাণ্ডুরং, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, জ্যোতিরাও ফুলে, বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু।

গ) রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী।

ঘ) বাহাদুর শাহ জাফর, নানা সাহেব, তিতুমির, মঙ্গল পাণ্ডে।

৩। **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :**

ক) ঔপনিবেশিক সমাজে কাদের 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' বলা হতো?

খ) নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কোন কোন প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন?

গ) স্যর সৈয়দ আহমদের সংস্কারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

ঘ) তিতুমির কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন?

৪। **নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :**

ক) সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলনের মধ্যে মূল মিলগুলি বিশ্লেষণ করো। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য কীভাবে চেষ্টা করেছিলেন?

খ) ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল বক্তব্য কী ছিল? ব্রাহ্ম আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাগুলি বিশ্লেষণ করো।

গ) সাঁওতাল হুল ও নীল বিদ্রোহের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো। উভয় বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই হিন্দু প্যাট্রিয়টের কী ভূমিকা ছিল?

ঘ) তুমি কী মনে করো ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ কেবল 'সিপাহি বিদ্রোহ' ছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫। **কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে) :**

ক) মনে করো তোমার সঙ্গে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে যথাক্রমে সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।

খ) মনে করো তুমি একজন সাংবাদিক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঐ বিদ্রোহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটি সংবাদপ্রতিবেদন লেখো।

৬ জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ

উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা বসেছিল। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেই সভায় সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সভা থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু হয়েছিল। তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম-এরও উদ্যোগ ছিল। হিউম তাঁর কাজের সূত্রে গোটা উপমহাদেশ ঘুরেছিলেন। সেই সুবাদে বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। হিউম সেই নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য বলতে থাকেন। পুনায় একটি বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও পুনায় কলেরার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় ঐ অধিবেশন সেখানে করা সম্ভব হয়নি। তার বদলে বোম্বাই শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে অধিবেশনটি বসে। সেই অধিবেশনই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।

জাতীয় কংগ্রেসের আগে জাতীয়তাবাদী সভাসমিতি

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বেশ কিছু সভাসমিতি। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন রূপে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দাবিদাওয়া তুলে ধরার প্রশ্নে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে *জমিদার সভা* (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। মূলত কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি তিনটিতে আঞ্চলিক গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আরও অনেক সভাসমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত সময়কালকে তাই অনেকেই *সভাসমিতির যুগ* বলেছেন। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকলেও ধীরে ধীরে এই সংগঠনগুলি আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদের প্রসারে ভূমিকা নিয়েছিল। নবগোপাল মিত্রের *জাতীয় মেলা* বা *হিন্দু মেলা*, শিশির কুমার ঘোষের *ইন্ডিয়ান লিগ* (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ), কর্নেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কির *থিওস্যফিক্যাল সোসাইটি* এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর *ভারত সভা* বা *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তোলা।

টুকরো কথা

ইলবার্ট বিল বিতর্ক

কোনও ভারতীয় বিচারকের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার ছিল না। গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের আইনসভার সদস্য সি.পি. ইলবার্ট বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে এই অসাম্য দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্তাবিত একটি বিলে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার দেওয়া হয়। এই বিলের প্রতিবাদে ইউরোপীয়রা সংগঠিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্বেতাঙ্গদের এই আন্দোলনের ফলে ঐ বিল প্রত্যাহার করা হয়। বিল প্রত্যাহার হলে ভারত সভার উদ্যোগে ভারতীয়রা আন্দোলন শুরু করেন। উভয়-পক্ষের আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন *ইলবার্ট বিল বিতর্ক* নামে পরিচিত। ভারত সভার আন্দোলনের জেরে ভারতীয় বিচারকরা শর্ত সাপেক্ষে ইউরোপীয় বিচারকদের বিচার করার অধিকার পায়।

টুকরো কথা

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় সম্মেলন (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের মধ্যে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পদক্ষেপগুলি বড়ো বেশিরকম জমিদার ঘেঁষা ছিল। অন্যদিকে কম বয়সি সদস্য অনেকেই কেবল জমিদারদের পক্ষ ছেড়ে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করতে উৎসাহী ছিলেন। তার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তরুণেরা সংগঠিত হন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নানা বিষয়ে সংঘাত তৈরি হয়েছিল।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা তৈরি হয়। দেশের জনগণকে বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একজোট করাই ঐ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন বা জাতীয় সম্মেলন কলকাতায় আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন রামতনু লাহিড়ি।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পিছনে হিউমের ভূমিকাকে ঘিরে একধরনের অতিকথন তৈরি হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট উইলিয়ম ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের একটি জীবনী সেই জন্য দায়ী। ওয়েডারবার্ন জানান যে, হিউম ও বড়োলাট লর্ড ডাফরিনের যৌথ উদ্যোগেই নাকি জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল। এই তত্ত্বটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার '*হিউম-ডাফরিন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব*' বলে পরিচিত।

দীর্ঘদিন 'হিউম-ডাফরিন-ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' দিয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ব্যাখ্যা করা হতো। কিন্তু ঐ তত্ত্বে বেশ কিছু ফাঁক দেখা যায়। তাছাড়া কংগ্রেসের উদ্যোগ নিয়ে ডাফরিন সন্দিহান ছিলেন। 'সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি' হিসাবে তিনি কংগ্রেসকে বিদ্রূপও করেন। ফলে ডাফরিনের নানা বক্তব্য থেকেই কংগ্রেস বিষয়ে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব ফুটে ওঠে।

ইলবার্ট বিলের পক্ষে ভারতীয়দের আন্দোলন। মূল ছবিটি দ্য গ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের কোনো ভূমিকাই ছিল না— তা নয়। কিন্তু তাকে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বের' ধাঁচে ফেললে অনৈতিহাসিক দোষ ঘটবে। নানা ঘটনায় ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবে উদারমনা হিউম চেয়েছিলেন এমন একটি সংগঠন তৈরি হোক, যা ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করবে। তবে হিউম যদি উদ্যোগ নাও নিতেন তবু ঐ সময় নাগাদ জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতো। কারণ তার সমস্ত পটভূমি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত ভারতীয়রা নানা রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেইসব উদ্যোগগুলিকে একজোট করার জন্য দেশজুড়ে নানা চেষ্টা করা হয়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নানা প্রকার প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেইসব প্রতিবাদের লক্ষ্য কখনও ছিল ব্রিটিশ-সরকারের আয়করনীতি, কখনও বৈষম্যমূলক আয়-ব্যয়। পাশাপাশি দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাগিচা শ্রমিকদের অবস্থা, আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়েও আন্দোলন করা হয়েছিল।

এইসমস্ত প্রতিবাদ আন্দোলনের চৌহদ্দি কেবল তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই আটকে ছিল না। লাহোর, অমৃতসর, আলিগড়, কানপুর, পাটনার মতো প্রাদেশিক শহরগুলির ইংরেজি শিক্ষিত মানুষেরা ঐসব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বোধের বাইরে একটা নতুন রাজনৈতিক বোধ তৈরি হয়েছিল। সেই বোধ অনেক বেশি *জাতীয়*। কংগ্রেস সেই জাতীয়-বোধেরই একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ ছিল।

একেবারে গোড়া থেকেই দেশের ভিতরের আঞ্চলিক পার্থক্য ও স্বার্থগুলোর বাইরে বৃহত্তর চিন্তা ও আদর্শের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। ফি বছরে দেশের এক একটি জায়গায় কংগ্রেসের অধিবেশন করা হবে— এই ছিল নীতি। বলা হয়, যে অঞ্চলে অধিবেশন বসবে সেখানের কেউ সভাপতি হতে পারবেন না। আঞ্চলিক স্বার্থ, মানসিক দূরত্ব সবকিছু দূর করে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যই এইসব নীতি নিয়েছিল কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঠিক করা হয় যদি কোনো প্রস্তাবে বেশিরভাগ হিন্দু কিংবা মুসলমানদের সমর্থন না থাকে, তবে সেই প্রস্তাব স্থগিত থাকবে। বস্তুত, গণতান্ত্রিক ও সার্বিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কংগ্রেস পরিচালনার লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস-নেতৃত্বের।

অবশ্য মনে রাখা দরকার গোড়া থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সাংগঠনিক নানা দুর্বলতা ছিল। ভারতীয় সমাজের সমস্ত ধরনের লোকেরা কংগ্রেসের আওতায় ছিল না। তাছাড়া আঞ্চলিক, লিঙ্গগত ও শ্রেণিগত প্রতিনিধিত্ব সমান ছিল না। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজন ও তাদের অভাব-অভিযোগকে সরাসরি সংগঠনের বৃত্তে আনতে চায়নি কংগ্রেসের আদি নেতৃত্ব। বস্তুত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'সম্মাননীয়' পেশার (যেমন- আইনজীবী) মানুষজনেরাই কংগ্রেসের নেতৃত্বের

টুকরো কথা

ব্রিটিশ শাসনে দমনমূলক কয়েকটি আইন

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক জারি করেন *নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন*। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার নাটকগুলির প্রচার বন্ধ করা। তারপরে লর্ড লিটনের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বেজায় সমালোচনা করে। তার পাল্টা লর্ড লিটন *দেশীয় মুদ্রণ আইন* জারি করেন (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ আইনে বলা হয় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি কোনো সরকার-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করতে পারবেনা। যদি এর অন্যথা হয় তবে সরকার ঐ সংবাদপত্রের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করবে।

ঐ আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড রিপন ঐ আইনটি বাতিল করেন। লর্ড লিটন ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য *অস্ত্র আইন* জারি করেছিলেন।

লর্ড লিটন

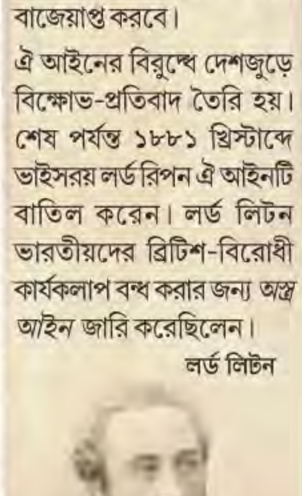

হাল ধরেছিলেন। পাশাপাশি, ভৌগোলিকভাবে বিচার করলে, কংগ্রেসের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী ৭২জন ভারতীয় বেসরকারি প্রতিনিধির মধ্যে ৩৮জনই ছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির। ফলে, মুখে 'সর্বভারতীয়ত্বের' দাবি করা হলেও, বাস্তবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রেসিডেন্সির কিছু শিক্ষিত পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও জমিদারই ছিল কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ। সম্প্রদায়গতভাবেও প্রথম দিকের কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে উচ্চবর্গীয় হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এইসব সমালোচনার বিষয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের 'জাতির প্রতিনিধি' হিসেবে প্রচার করে গৌরব বোধ করতেন। তবে এর ফলে সামাজিক ও সম্প্রদায়গতভাবে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচিগুলি প্রকৃত 'জাতীয়' চরিত্র হারিয়েছিল।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিপর্বে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক পন্থা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার লক্ষ্যে চলেনি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের আমূল বদলের কর্মসূচি কংগ্রেসের ছিল না। বরং ভারতে '*অ-ব্রিটিশ*' সুলভ কিছু শাসনপদ্ধতি সংশোধনের জন্য কংগ্রেস-নেতৃত্ব আবেদন-নিবেদন করতেন সরকারের কাছে। প্রথম অধিবেশনেই (১৮৮৫ খ্রি:) সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলেন যে, কংগ্রেস কোনো ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের মঞ্চ নয়। বস্তুত, আদি পর্যায়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি নিজেদের আনুগত্য ও সমর্থন জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর ঠিক সেই কারণেই হিউমকে মধ্যস্থ হিসাবে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের কাজকর্মের সঙ্গে। তার ফলে আশা করা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে সন্দেহের নজরে দেখবে না।

অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

এইভাবে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫-'০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ২০-২২ বছর জাতীয় কংগ্রেস ভারতের উচ্চবর্গের মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। তবে সরকারের কাজে ভারতীয় জনগণের সম্যক অংশগ্রহণ থাকা উচিত — কংগ্রেসের এই দাবিটির গুরুত্ব ছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দু-দশক : অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

লর্ড ডাফরিন

প্রথম দু-দশকের কার্যকলাপের নিরিখে বিচার করলে কংগ্রেসের আদিপর্বের নেতৃত্বকে '*নরমপন্থী*' বলে চিহ্নিত করা যায়। সেই সময়ে কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল বার্ষিক অধিবেশন-কেন্দ্রিক। তাকে ব্যঙ্গ করে '*তিন-দিনের তামাশা*'-ও বলা হতো। বিভিন্ন প্রতিনিধি ঐসব অধিবেশনে নানারকম বক্তব্য ও প্রস্তাব পেশ করতেন। সবশেষে তার মধ্যে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে অধিবেশন শেষ হতো। তবে বছরভর ঐসব গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে জাতীয় স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করার মতো উদ্যোগ দেখা যেত না। তাছাড়া বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিগত পেশা নিয়েই

ব্যস্ত থাকতেন। সারা বছর সংগঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়ার সময় ও মানসিকতা—কোনোটাই তাঁদের ছিল না। যদিও মনে রাখা দরকার 'নরমপন্থা'র মধ্যেও নানা পার্থক্য ছিল। তবে মোটের উপর প্রতিবাদ-আন্দোলনের পদ্ধতি ও লক্ষ্যগুলি ছিল একইরকম।

অধিকাংশ নরমপন্থীর কাছে ব্রিটিশ শাসক ছিল '*বিধির বিধান*'। তাই নরমপন্থীরা অভিযোগ করতেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সর্বদা আইনের শাসন মোতাবেক চলছে না। তবে একথা বলা উচিত যে, শ্রেণিগত স্বার্থের থেকে সবসময় বেরোতে না পারলেও সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়কে নরমপন্থীরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। সেদিক থেকে তাঁদের কাজকর্মে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ লক্ষ করা যায়।

নরমপন্থীরা চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শাসনের আওতায় থেকেই ভারত আংশিক স্বশাসন ভোগ করবে। আইনসভাগুলিতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দাবি জানাতেন নরমপন্থীরা। অর্থাৎ, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন আদি কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রধান কর্মসূচি ছিল না। কিছু কিছু সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যেই তাঁদের প্রতিবাদ-আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছিল। নরমপন্থীরা অবশ্য আশা করতেন একসময় ভারতবাসীরা স্বশাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সেই স্বশাসনের অধিকার স্বীকার করে নেবে।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিশ্লেষণ

"....আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং সভ্য জগতে আমাদের মর্যাদার স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়মতন্ত্র ও সীমাবদ্ধতার গণ্ডী ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাবনা সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে এই যে সে রকম প্রয়োজন এখনও দেখা দেয়নি।.... আমরা যদি ঘোষণা করি যে আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হতে চাই, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের সদস্য হিসাবে কোন দায়-দায়িত্বের বাধার মধ্যে না থেকে খাঁটি স্বায়ত্তশাসন চাই, কেউই আমাদের সে আশা আকাঙ্ক্ষায় আপত্তি করতে পারে না।.... কিন্তু আমাদের পরিবেশের কথা ঘটনা পরম্পরার কথা ভাবতে হবে।.... তাহলে এখন যদি আমরা এই ভাবাদর্শকে আংকড়ে ধরে থাকি এবং আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে তাকে জোরদার করার চেষ্টা করি তা হলে কি ঘটবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি আমাদের সে আশা পূরণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হবে কিন্তু আমরা যদি আমাদের দাবি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির সমস্ত প্রভাব আমাদের পক্ষেই থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা যে কেবলমাত্র কোন বাধাই পাব না, তা নয়, আমরা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সহানুভূতি হয়ত সাহায্যও পাব;....।....

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের পরে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে হলে আরো উন্নতি সাধনের জন্য কি করা না করা, তা আমাদের উত্তরাধিকারীদের ভাবনার জন্য রেখে যেতে পারি। .... ইতিমধ্যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করার জন্য কাজ করে যাব।"

[উদ্ধৃত অংশটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আত্মজীবনী *A Nation in Making*-এর বাংলা তরজমা থেকে নেওয়া। বাংলা তরজমাটি নলিনীমোহন দাশগুপ্ত-র করা। (বাংলা তরজমার মূল বানান অপরিবর্তিত)]

যদিও ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে নরমপন্থীদের এইসব ভাবনাচিন্তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তাই নরমপন্থীদের প্রায় কোনো দাবিই সরকারের তরফে মানা হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটানো হয়নি। সেখানে সদস্য নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন বা বেছে নেওয়ার উপরেই জোর পড়েছিল। তাছাড়া আইনসভাতে আয়-ব্যয়ের হিসেব নিয়ে ভোটাভুটি করা যেত না। এমনকি আইনসভাকে না জানিয়ে আইন চালু করার ক্ষমতাও ব্রিটিশ সরকারের ছিল।

নরমপন্থীদের আর একটি দাবি ছিল সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের নিয়োগ বাড়ানো হোক। তাঁরা বলতেন, প্রশাসনের ভারতীয়করণ হলে, সেই প্রশাসন দেশীয় মানুষের অভাব-অভিযোগগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। তাছাড়া, অবসরপ্রাপ্ত ইউরোপীয় চাকুরেদের প্রদেয় যাবতীয় অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। ঐ পদগুলিতে ভারতীয়রা বহাল হলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে। নরমপন্থীদের দাবি ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার বয়স ১৯-এর বদলে ২৩ বছর করতে হবে। পাশাপাশি, ভারতে ও লন্ডনে একইসঙ্গে পরীক্ষাটি নিতে হবে। কিন্তু এই দাবিগুলির প্রতি ব্রিটিশ-শাসকেরা মোটেই নজর দিতে চায়নি। কারণ, প্রশাসনের ভারতীয়করণ তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। ক্রমে পুরো বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীকে বিদেশের নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যবহার করা ও যুদ্ধখাতে খরচ বাড়ানো নিয়েও নরমপন্থীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। তবে ব্রিটিশ সরকার এই প্রসঙ্গেও বিশেষ মনোযোগ দেয়নি।

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে নরমপন্থীদের প্রায় কোনো দাবিতেই ঔপনিবেশিক শাসক গুরুত্ব দিতে নারাজ। বস্তুত, নরমপন্থীদের আন্দোলনের নীতি ও সংকুচিত সামাজিক ভিত্তি এর জন্য দায়ী ছিল। ফলে, এইদিক থেকে দেখলে কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বাস্তবে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার কোনো জরুরি সংস্কার ঘটাতে পারেননি।

দাদাভাই নৌরজি

টুকরো কথা
অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

একটি বিষয়কে ঘিরে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তা হলো, ভারতের আর্থিক দুরবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা নিয়ে নরমপন্থী নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়াকে *অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ* (Economic Nationalism) বলা হয়। এই কাজে বিশেষ করে দাদাভাই নৌরজি (পেশায় ব্যবসায়ী), মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (পেশায় বিচারক) ও রমেশচন্দ্র দত্ত (পেশায় সিভিল সার্ভেন্ট) — এই তিনজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের দারিদ্র্য ও ব্রিটিশ-শাসনের সম্পর্ক নির্ণয় করা। নরমপন্থীদের যুক্তি ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র ক্রমে বদলে গিয়েছে। ভারত ধীরে ধীরে ব্রিটেনের কৃষিজ

কাঁচামাল আহরণের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যগুলির বৃহৎ বাজার হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করতে থাকে ঔপনিবেশিক সরকার। এসবের ফলে ভারতের কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিকে কেবল ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে ভারত। আর সেই উদ্যোগের যাবতীয় লাভ চলে যায় ব্রিটেনে। ফলে ভারতীয় কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হয়, দেশের যাবতীয় সম্পদ চলে যায় বিদেশে। নরমপন্থীদের এই যুক্তিকে '*সম্পদ নির্গমন*' বলা হয়। তাঁরা বলতেন এইভাবে সম্পদ নির্গমনের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে পড়েছে।

পাশাপাশি উঁচু হারে ভূমি-রাজস্ব দিতে বাধ্য হয় কৃষকরা। ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য মার খায়। কারণ, ব্রিটিশ পণ্য আমদানিতে শুল্ক বা মাশুল বসানো হতো না। তার ফলে ভারতের শিল্পায়ন ব্যাহত হতে থাকে। শিল্পের বদলে কৃষির উপর চাপ বাড়ে। অধিকাংশ লোক কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ার ফলে ও কৃষির উপযুক্ত কাঠামো না থাকায় দেশের দারিদ্র্য আরও বেড়েছিল। এই নেতিবাচক বিষয়গুলির প্রতিকার করে একটি *জাতীয় অর্থনীতি* গড়ে তোলার ভাবনাই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণেও নরমপন্থী রাজনীতি ভারতের বৃহত্তর জনগণের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ফলে নরমপন্থীরা ক্রমে সমালোচিত হয়েছিলেন তাঁদের আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে । আদি পর্যায়ের অনেক কংগ্রেসি কার্যকলাপের পিছনে জমিদারদের আর্থিক সহায়তা ছিল। ফলে জমিদারদের স্বার্থ বাদ দিয়ে চলার কথা কংগ্রেস ভাবতে পারেনি। তার জন্যই কৃষকদের স্বার্থে প্রকৃত কোনো কর্মসূচি ছিল না নরমপন্থীদের কাছে। এমনকি রমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে কংগ্রেসেরই একটি অংশ ছোটো কৃষকদের স্বার্থের কথা তুলে ধরত, তারা ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একইভাবে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সমর্থন-পুষ্ট কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তাছাড়া নরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে দুই-একটি ব্যতিক্রম (যেমন– বদরুদ্দিন তৈয়াবজি) বাদ দিলে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসে প্রায় ছিলই না। ফলে, প্রথম কুড়ি বছরের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ প্রায় আলোচনাই করা হতো না।

অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে নরমপন্থী রাজনীতি লক্ষ্য ও কর্মসূচির দিক থেকে ছিল সীমিত চরিত্রের। তাতে জনগণের অংশগ্রহণ প্রায় ছিল না। সেই কারণেই ব্রিটিশ-প্রশাসন জাতীয় কংগ্রেসকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। বরং, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েই বেশি মশগুল বলে কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করা হতো।

এভাবে বিচার করলে অবশ্য কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতির পর্যায়টিকে পুরো ব্যর্থ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন নরমপন্থীরা। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার ফলেই যুক্তিনির্ভর সাংবিধানিক রাজনীতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র তাঁরা তৈরি করেছিলেন। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলন গণআন্দোলন ছিল না। সেইসব আন্দোলনের থেকে বিশেষ কোনো সুবিধাও ভারতীয়রা পায়নি। তবুও, ঐ যুক্তিনির্ভর রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক আধুনিকতা ভারতীয় সমাজে দেখা গিয়েছিল। সেইখানেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের সঙ্গে ১৮৮৫-র জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের তফাত।

নিজে করো

তোমার ক্লাসে বন্ধুরা দুটি দলে ভাগ হয়ে নরমপন্থা ও চরমপন্থার যুক্তি ও বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে বিতর্কসভা আয়োজন করো।

চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব

বাস্তবগ্রাহ্য রাজনৈতিক সাফল্য লাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে কংগ্রেসের ভিতরেই নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন পদ্ধতিকে *'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি'* বলে ব্যঙ্গ করা হতে থাকে। বিংশ শতকের শুরুতেই নরমপন্থার নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। নরমপন্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটে। চরমপন্থার সমর্থকরা কংগ্রেসের *'চরমপন্থী'* গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হন। প্রধানত বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চরমপন্থার বিকাশ হয়। ঐ তিনটি অঞ্চলের প্রধান তিন নেতা ছিলেন যথাক্রমে বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রাই। এঁদের তিনজনকে একসঙ্গে *'লাল-বাল-পাল'* বলে অভিহিত করা হতো। তবে অন্যান্য অঞ্চলেও কম-বেশি চরমপন্থী মতামতের প্রসার ঘটেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো চরমপন্থা কী কেবল নরমপন্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছিল? একদিক থেকে দেখলে নরমপন্থী রাজনীতির নিষ্ক্রিয়তাজনিত হতাশার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই চরমপন্থা দানা বেঁধেছিল। আদিপর্বে কংগ্রেস যেসব জমিদারদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চলত, তারাও ক্রমে টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ক্ষেত্রে নরমপন্থীরা আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। তাছাড়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিল না কংগ্রেসের। তার ফলে সাধারণ মানুষের থেকেও আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ তৈরি হয়নি।

লাল-বাল-পাল

পাশাপাশি আদিপর্বের কংগ্রেসের মধ্যের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমপন্থার উদ্ভবে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সংগঠন ও সংবাদপত্রের সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। যেমন *বন্দে মাতরম* পত্রিকার

সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল। মহারাষ্ট্রের *পুনা সার্বজনিক সভা*-র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নরমপন্থী গোখলের সঙ্গে চরমপন্থী তিলকের দ্বন্দ্ব বেধেছিল। এইসব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব জাতীয় কংগ্রেসের উপরও পড়ে।

লর্ড কার্জনের কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্কার নরমপন্থী নিষ্ক্রিয়তাকে বেশি স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আইন করে কলকাতা পৌরসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে দেন কার্জন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আইন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। ঐ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছিল। তাছাড়া বাংলা ভাগ করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। এইসব পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের স্বশাসনের অযোগ্য *'পৌরুষহীন'* জাতি বলে বর্ণনা করত। সেই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে চরমপন্থীরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যক্তিদের *'জাতীয় আদর্শ'* বলে তুলে ধরতে থাকে। সেই মতো মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে *শিবাজি উৎসব* চালু হয়। তার পাশাপাশি শরীরচর্চার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। বিশেষত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় চরমপন্থী নেতৃত্ব আখড়া, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন। সেইসব জায়গায় কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরা-তরবারি প্রভৃতি চালানো ইত্যাদি শেখানো হতো।

সরলা দেবী

টুকরো কথা

সরলা দেবী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব

"যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল।.... সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি।.... আমি একটু ভেবে তাকে বললুম — "আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব— এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যোলোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব।...."

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালী-হয়ে-যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে জোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভুপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল।... শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের একদিকে

টুকরো কথা

চরমপন্থীদের স্বরাজভাবনা

আদর্শগতভাবে চরমপন্থীদের লক্ষ্য ছিল *'স্বরাজ'* অর্জন করা। তবে বিভিন্ন চরমপন্থী নেতা বিভিন্নভাবে 'স্বরাজ' ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল মনে করতেন স্বরাজ মানে চূড়ান্ত স্বাধীনতা। তাই ব্রিটিশের অধীনে থেকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। অরবিন্দ ঘোষেরও স্বরাজ বিষয়ে ধারণা সেরকমই ছিল। কিন্তু, তিলকের মতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে প্রশাসনকে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে আনার মধ্যে দিয়ে। বাস্তবে বেশিরভাগ নেতাই স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই স্বশাসনের অধিকারকে বুঝতেন। ফলে চরমপন্থী আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের বদলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সরকারে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য আইনগুলি অমান্য করার মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনের বিরোধিতা করার ডাক দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ও জিনিসপত্র বর্জনের কথা বলা হয়। সেসবের বিকল্প হিসেবে দেশীয় শিক্ষা, দেশীয় শিল্প প্রভৃতির উপরে জোর দেন চরমপন্থী নেতৃত্ব।

খোদা ছিল— " দেবাঃ দুর্বলর্ঘাতকাঃ"।"

সরলা দেবীর প্রতাপাদিত্য উৎসবের উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে 'জাতীয় বীর' বলে তুলে ধরার বিপক্ষে ছিলেন।

[উদ্ধৃত অংশটি সরলাদেবী চৌধুরাণী-র *জীবনের ঝরাপাতা* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

নরমপন্থী নেতারা ইংরেজি শিক্ষা থেকে পাওয়া জাতীয়তাবাদের ধারণা দিয়ে ভারতবর্ষকে আধুনিক করার ভাবনা ভেবেছিলেন। অন্যদিকে চরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক শাসনের সার্বিক বিরোধিতা করার ফলে ইংরেজি শিক্ষাজাত জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমালোচনা করতে থাকেন। সেকাজ করতে গিয়ে চরমপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বিচারে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সমস্ত কিছুকেই 'গৌরবময়' বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যদিও সেই 'গৌরবময়' ইতিহাস প্রায় সবক্ষেত্রেই হিন্দুদের গুণকীর্তনে পরিণত হয়েছিল। তবে তা নিয়ে চরমপন্থীদের বিশেষ উদ্‌বেগ ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রেই বিনা বিচারে বেশ কিছু চরমপন্থী নেতা হিন্দুত্বের ধ্যানধারণাকেই 'জাতীয় ধারণা' বলে প্রচার করতেন।

অরবিন্দ ঘোষ

১৯০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সংঘাত গুরুতর হয়ে ওঠে। লালা লাজপত রাই ও তিলকের মতো চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করে ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। ১৯০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল কতদূর পর্যন্ত চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য। তবে এই গ্রহণযোগ্যতার সীমারেখা নিয়ে ক্রমেই মীমাংসার পথ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বেশ কিছু নরমপন্থীর বিরোধিতা সত্ত্বেও চরমপন্থীরা বাংলার নরমপন্থীদের সহায়তায় জিতে যায়। সেই অধিবেশনে স্বরাজ, স্বদেশি, বয়কট (বিদেশি দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বর্জন) ও জাতীয় শিক্ষা— এই চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনেক নরমপন্থী নেতা ঐ প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেননি। কার্যত কলকাতা অধিবেশনেই কংগ্রেসের ভিতরে চরমপন্থী গোষ্ঠীর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। সেই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক।

টুকরো কথা

জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন

পুনা শহরে ১৯০৭খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুনায় চরমপন্থীরা শক্তিশালী সেই যুক্তিতে নরমপন্থীরা অধিবেশনটি সুরাটে করার প্রস্তাব দেন। সুরাট অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়। হই-হট্টগোল ও গোলমালের মধ্যে সুরাট অধিবেশন শেষ হয়। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চরমপন্থী তিলক তখনও চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসকে ঐক্যবন্ধ রাখতে। কিন্তু ফিরোজ শাহ মেহতা চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এলাহাবাদ অধিবেশন আয়োজন করেন। অন্যদিকে চরমপন্থী নেতারাও নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ফলে কার্যত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী বিবাদে ধাক্কা খেয়েছিল।

টুকরো কথা

কংগ্রেসের বিভাজন: রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ

"কন্‌গ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কন্‌গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে, কিন্তু ঠিকমত প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

....

এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহার অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পারো, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পারো না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতিমহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কন্‌গ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না।....

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহাতে যাহা হয় তা হোক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে— এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

....

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে।"

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন চরমপন্থার সবথেকে জোরালো নজির ছিল। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বভারতীয় স্তরে নরমপন্থার বিকল্প হিসেবে চরমপন্থার বাস্তব রূপটি হাজির হয়েছিল। লর্ড কার্জন প্রস্তাবিত বাংলা বিভাজনের উদ্যোগকে রদ করার জন্যই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাংলায় ব্রিটিশ-শাসনের সমালোচক ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই কার্জন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন। উনবিংশ শতকেই বাংলা প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমানা ছিল বিরাট। ঐ বিরাট অঞ্চলে সুষ্ঠু

লর্ড কার্জন

প্রশাসনিক তদারকি ক্রমেই অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল। তার ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বিভাজন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কার্জনের আমলে জনগণনায় দেখা যায় বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বাংলা বিভাজনের তড়িঘড়ি উদ্যোগ নেন কার্জন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই সরকারিভাবে বাংলা বিভাজনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। সে বছরই ১৬ অক্টোবর ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়।

যথার্থই প্রশ্ন ওঠে কেবল প্রশাসনিক সুবিধা অর্জনই কি ব্রিটিশ সরকারের তরফে বাংলা বিভাজনের একমাত্র কারণ ছিল? ঔপনিবেশিক সরকার জোরের সঙ্গেই প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি পেশ করেছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক অঞ্চল বিভাজনের ভিতরে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক সরকারের ভেদনীতিকেই দায়ী করেছিলেন। বস্তুত, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ও বাঙালিদের রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্ভাবনা দুর্বল করে দেওয়ার জন্যেই বাংলা বিভাজন করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকদের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষকে শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ দেওয়ার যুক্তি দেখিয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন।

আদতে অবশ্য বাংলা ভাগের উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়নি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বাঙালি সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৯০-এর দশকে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চূড়ান্ত হয়েছিল। তার ফলে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে । ফলে বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত জনগণের পক্ষে দিন গুজরান কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের তরফে বাংলা বিভাজনের উদ্যোগ চূড়ান্ত বিক্ষোভ উশকে দিয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্রুতই সেই আন্দোলন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই হয়ে উঠেছিল স্বদেশি আন্দোলন।

টুকরো কথা

স্বদেশি যুগ: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে

"ভূমিকম্পের বছর সেটা, নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে। .... সেখানে রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে— বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। বললুম, হ্যাঁ, এটা হওয়া চাই যে করে হোক।.... চাঁইরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ইংরেজিতে তেমনিই হবে প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সে। প্যান্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। কাউকে আর মুখ খুলতে দিই না। ইংরেজিতে মুখ খুললেই 'বাংলা' 'বাংলা' বলে চেঁচাই। শেষটায় চাঁইদের মধ্যে অনেকেই বাগ মানলেন।.... যাক, আমাদের তো জয়জয়কার। বাংলা ভাষার প্রচলন হল কন্‌ফারেন্সে।

সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।....

আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি। .... রবিকাকা গান তৈরি করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশের কাজ স্বদেশী ভাব এই ছাড়া আর কথা নেই। নিজেদের সাজসজ্জাও বদলে ফেললুম।....

....

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, ...। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হত। ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরি করে মা আমাদের দিলেন— সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত।

....

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। .... ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব— রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। .... রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে— মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম— যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল— বাংলার মাটি, বাংলার জল,/ বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চার দিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল— সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। .... হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব।....

....

বেশ চলছিল আমাদের কাজ। মনে হচ্ছিল এবারে যেন একটা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভাইভাল হবে দেশে। দেশের লোক দেশের জন্য ভাবতে শুরু করেছে, সবার মনেই একটা তাগিদ এসেছে, দেশকে নতুন একটা কিছু দিতে হবে। এমন সময়ে সব মাটি হল যখন একদল নেতা বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পারে। রবিকাকা বললেন, এ কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া — জোর জবরদস্তি করা নয়। .... বিলিতি বর্জন শুরু হল, বিলিতি কাপড় পোড়ানো হতে লাগল, পুলিশও ক্রমে নিজমূর্তি ধরল। টাউন হলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাঁড়ুজ্জে বয়কট ডিক্লেয়ার করলেন রবিকাকা তখন থেকেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এর মধ্যে নেই।

ভারতমাতা

গেল আমাদের স্বদেশী যুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবির জগতে।"

[উদ্ধৃত অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *ঘরোয়া* রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন প্রকৃত গণআন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন বড়ো শহর বা মফস্‌সলের শিক্ষিত ভদ্রলোক গোষ্ঠীর মানুষ। ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধিকাংশ জনগণের উপযোগী কোনো কর্মসূচি হাজির করতে স্বদেশি নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের জন্য অনেকক্ষেত্রে সাধারণ গরিব মানুষের উপর জোরজুলুম করা হতো। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি দ্রব্যের তুলনায় স্বদেশি দ্রব্যের দাম অনেক বেশি হতো। সেইসব দ্রব্য কেনার ক্ষমতা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের থাকলেও, বেশিরভাগ গরিব জনগণের ঐ ক্রয় ক্ষমতা ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় স্বদেশি দ্রব্যের জোগানও ছিল খুবই কম। একই কথা স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালতের ক্ষেত্রেও খাটে। পাশাপাশি স্বদেশি নেতৃত্ব যখন শ্রমিক ধর্মঘট আয়োজন করতেন তখন তার থেকে হিন্দুস্তানি শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিকেরা বাদ পড়ে যেত। ফলে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরমপন্থীদের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনে শামিল হতে পারেননি। তাছাড়া বেশ কিছু চরমপন্থী নেতা স্বদেশি আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীক ও দেবদেবীর প্রসঙ্গ ব্যবহার করতে থাকেন। সেইসব প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে ওঠে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও বৈষ্ণব কৃষকেরা চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হতে পারেনি।

টুকরো কথা

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ: রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়।....

....

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি ; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।....

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে

টুকরো কথা

স্বদেশি শিল্প

বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন তাঁত, রেশম ও আরো কতগুলি দেশীয় শিল্পকে নতুন করে উৎসাহ জুগিয়েছিল। বিদেশি বা দেশি বড়ো কল-কারখানায় তৈরি জিনিসপত্রের বদলে দেশীয় ছোটো ছোটো শিল্পের উদ্যোগ শুরু হয় বাংলায়। ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষা নেওয়ার জন্য জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠানোর জন্য তহবিল গড়ে তোলা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস। চিনা মাটির পাত্র, সাবান, দেশলাই প্রভৃতির দেশীয় কল-কারখানা তৈরি হয়। তবে মূলধনের অভাবে স্বদেশি শিল্প বিশেষ সাফল্য পায়নি। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর ব্যতিক্রম।

নিজে করো

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বিদ্রোহ নিয়ে লেখা বেশ কিছু গল্প, কবিতা ও গান সংগ্রহ করো। তোমার সংগ্রহের লেখাগুলির সঙ্গে কোন ধরনের আন্দোলন-বিদ্রোহের মিল আছে তা খুঁজে বের করো।

হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।....

....

যাহা হউক 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল।....

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। .... লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে 'আমরা উভয়ে ভাই' — তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। .... কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়— সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।"

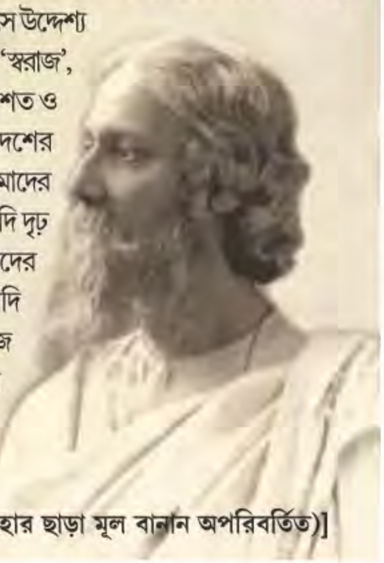

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা

জাতীয় শিক্ষা

স্বদেশি আন্দোলনের ফলে ইংরাজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরাগ তৈরি হয়। মাতৃভাষায় সমস্ত বিষয়ে পঠনপাঠনের চর্চার উদ্যোগ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন এই উদ্যোগের একটি উদাহরণ। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অভ এডুকেশন)। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বেশ কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় তৈরি হয়। অনেক ছাত্রই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতো। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় খুবই বিখ্যাত ছিল। সেইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী হিসাবেও কাজ করত। ঢাকার কাছে সোনারঙ জাতীয় বিদ্যালয়ের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে টাকার বরাদ্দ কম থাকার জন্য জাতীয় শিক্ষার বিস্তার থমকে যায়।

সতীশচন্দ্র বসু

অনুশীলন সমিতির প্রতীক

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ

স্বদেশি আন্দোলনের শেষ দিকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারাটি বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধারার একটি প্রধান ভিত্তি ছিল বিভিন্ন সমিতিগুলি। আপাতভাবে সমিতিগুলিতে শরীরচর্চা হতো। তার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজে সমিতিগুলি এগিয়ে আসত। তার মধ্যে দিয়ে মূলত ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে স্বদেশির ভাবধারা প্রচার করা হতো। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্বদেশি আন্দোলন সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারাটি প্রবল হয়ে ওঠে। গঠনমূলক আন্দোলনের বদলে ব্রিটিশ প্রশাসক ও তাদের সহযোগী দেশীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে থাকেন অনেকে। জনগণের জন্য প্রকৃত আন্দোলনের কর্মসূচি না নিতে পারার ফলে ব্যক্তিগত স্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে হিংসার ব্যবহার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৭৬-'৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে সাধারণ মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল টাকা। সেই টাকা জোগাড় করার জন্যই ফাদকে তাঁর দলকে ডাকাতি করতে পাঠান। তবে শেষে অবধি ফাদকে ধরা পড়েন ও তাঁর সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন সমিতি ও আখড়ার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানো হতে থাকে। বাংলাতেও শরীরচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি দল তৈরি হয়। এগুলির মধ্যে সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত *অনুশীলন সমিতি* অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এই সমিতিগুলির বিপ্লবী কার্যকলাপ গোপনে চালানো হতো।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে *ঢাকা অনুশীলন সমিতি* তৈরি হয়। সারা বাংলাব্যাপী বিপ্লবীদের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। *যুগান্তর* পত্রিকা হয়ে ওঠে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপত্র। অর্থ জোগাড় করার জন্য স্বদেশি ডাকাতির পাশাপাশি বোমা বানানোর উদ্যোগও নেওয়া হতে থাকে। কলকাতার মানিকতলায় বোমা তৈরির কারখানা বানানো হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বাংলার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারার উদ্যোগ নেন।

কিংসফোর্ডকে মারার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর সরকারের তরফে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি চূড়ান্ত দমন-পীড়ন চালানো হয়। মানিকতলার বোমা কারখানাটির হদিস পেয়ে যায় ব্রিটিশ প্রশাসন। বিভিন্ন বিপ্লবী নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড

অথবা কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার ফলে বাংলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছিল।

উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের নিরিখে বিচার করলে প্রথম পর্বের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ খুব একটা সফল হয়নি। নানান কারণে তাঁদের অধিকাংশ কর্মসূচি হয় ধরা পড়ে গিয়েছিল, অথবা ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া প্রয়োজনের কারণে তাঁদের কাজকর্ম গুপ্ত হওয়ার ফলে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচি হাজির করতে পারেনি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সমাজে তার প্রভাব পড়ত। ব্যক্তিগত স্তরে বিপ্লবীদের আদর্শ ও সাহস অনেক ক্ষেত্রেই অনুপ্রেরণার বিষয় হয়েছিল। তবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদকে নরমপন্থী 'ভিক্ষাবৃত্তি'-র থেকে ভালো মনে করলেও সবাই সেই পথে চলতে চাননি। অবশ্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার প্রস্তাবকে অনেকেই বৈপ্লবিক কাজকর্মের ফলাফল হিসেবে ভেবেছিলেন।

জন মর্লে

টুকরো কথা
মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয়রা প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে শুরু করে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় চরমপন্থীদের কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তায় ফেলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বড়োলাট মিন্টো এবং ভারতসচিব মর্লে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস করেন। এই আইনে বড়োলাটের কার্যনির্বাহক পরিষদে ও প্রাদেশিক আইনপরিষদে সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ভারতীয়দের প্রতি উদার মনোভাব দেখানো হয়। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থীদের বিপরীতে নরমপন্থীদের কাছে টেনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকেও উশকে দেওয়া হয়েছিল।

আর্ল অভ মিন্টো

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর ভারতের গদর দলের উদ্যোগে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে। বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও বাঘা যতীনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

টুকরো কথা
কিংসফোর্ড-হত্যার চেষ্টা

বিচারক কিংসফোর্ডকে মারার জন্য বেশ কিছু সময় ধরেই পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল মজফফরপুরে কিংসফোর্ডের ফিটনগাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা খেয়াল করেন নি যে গাড়িটা কিংসফোর্ডের হলেও তাতে তিনি ছিলেন না। তার বদলে মিসেস ও মিস কেনেডি ঐ গাড়িতে ছিলেন। বোমার আঘাতে কেনেডিরা মারা যান। পরদিন ক্ষুদিরাম রিভলবার সমেত ধরা পড়েন। পুলিশের হাত এড়াতে প্রফুল্ল চাকি নিজে নিজেকে গুলি করেন। আদালতে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়। ক্ষুদিরামের স্মরণে গান লেখা হয় : একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।

ক্ষুদিরাম বসু

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা বসেছিল — (বোম্বাইতে/গোয়ায়/মাদ্রাজে)।

খ) নরমপন্থীদের দাবি ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স করতে হবে— (২১/২৩/২০) বছর।

গ) বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করেছিলেন— (ডাফরিন/কার্জন/মিন্টো)।

ঘ) বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল— (যুগান্তর/হিন্দু প্যাট্রিয়ট/সোমপ্রকাশ) পত্রিকা।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ) নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের কার্যকলাপকে 'তিনদিনের তামাশা' বলতেন।

গ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

ঘ) ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়েছিলেন।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ টি শব্দ) :

ক) সভাসমিতির যুগ কাকে বলে ?

খ) কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যেকার দুটি মূল পার্থক্য উল্লেখ করো।

গ) ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের গুরুত্ব উল্লেখ করো ?

ঘ) বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল কেন ?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিউমের ভূমিকার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করো। তোমার কী মনে হয় হিউম না থাকলেও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হতো ? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

খ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্য কী ছিল ? ঐ বক্তব্যের সঙ্গে বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের কোনো যোগ তুমি খুঁজে পাও কী ? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো।

গ) চরমপন্থী আন্দোলনের মূল বক্তব্য কী ছিল ? তাঁদের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহারকে কী তুমি সমর্থন করো ? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পটভূমি কীভাবে তৈরি হয়েছিল ? কেন বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের অনেক উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয় ?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরা যাক তুমি একজন চরমপন্থী নেতা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তোমায় আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। জনগণের কাছে তোমার বক্তব্য তুলে ধরে একটি বক্তৃতার খসড়া তৈরি করো।

খ) মনে করো তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছ। রাখি বন্ধনের দিনে তোমার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো।

৭ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন

ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ও তার পরবর্তী সময়ে এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলি ক্রমে গণআন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। পাশাপাশি অবশ্য কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন-গুলিও চলেছিল। আর বামপন্থী ভাবনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠনগুলিও উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিই ছিলেন ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধানতম নেতৃত্ব।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল। তার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খ্রি:) চলাকালীন মহাত্মা গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল।

মহাত্মা গান্ধি : অহিংস সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ ভাবনা

গান্ধির আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্যে কতগুলি নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনার ছাপ দেখা গিয়েছিল। কয়েকটি আদর্শগত ভাবনাও গান্ধিবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতবর্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধি বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী একটি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন থেকেই ধীরে ধীরে গান্ধিবাদী '*সত্যাগ্রহ*'-র ধারণা তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন ধর্ম-ভাষা-অঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করেছিলেন গান্ধি। সেই আন্দোলন প্রচার পাওয়ার ফলে গান্ধি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। সেইসময় ভারতের বিভিন্ন

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁর অন্যান্য সহযোগী।

টুকরো কথা
ভারতের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

এশিয়া ও ইউরোপের ছোটোবড়ো অনেক দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়ে নরমপন্থীরা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বহু ভারতীয় সৈন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায়। সামরিক খাতে খরচ বেড়ে গিয়েছিল। যার ফলে দরকারি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। সেই সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। ১৯১৮-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধির কারণে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আগের তুলনায় অনেক সংগঠিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি ভারতীয়দের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

> **টুকরো কথা**
> *মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার*
>
> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের যে সব অধিকার দেবে বলে ঘোষণা করেছিল, তার কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে ভারতে স্বশাসনের আন্দোলন বা *Home Rule Movement* জোরদার হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-সচিব মন্টেগু এবং লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। যদিও ঐ সংস্কারগুলি ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ ভারতীয়দের স্বশাসনের দাবিকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে মানা হয়নি।

রাজনৈতিক নেতারা মূলত এক একটি অঞ্চলের নেতা ছিলেন। কিন্তু, দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের সুবাদে গোড়া থেকেই গান্ধির কোনো বিশেষ আঞ্চলিক ভাবমূর্তি তৈরি হয়নি।

গান্ধির *'সত্যাগ্রহ'* ও *'অহিংসা'*র আদর্শদুটি পরস্পর সম্পর্কিত। এইদুটিকে একসঙ্গে *'অহিংসা সত্যাগ্রহ'*ও বলা হয়। গান্ধি মনে করতেন সত্যের খোঁজ করাই মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফলে সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাজনৈতিক আন্দোলনেরও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাশাপাশি হিংস্র পথে রাজনৈতিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পন্থাকেও গান্ধি সমালোচনা করেন। গান্ধির আন্দোলনের চরিত্র একদিকে ছিল গণমুখী। অর্থাৎ, অধিকাংশ জনগণকে আন্দোলনে টেনে আনার মাধ্যমেই অহিংস-সত্যাগ্রহ সফল হবে। কিন্তু, তার পাশাপাশি, অহিংস-ও সত্যাগ্রহের আদর্শ জনগণকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে বলে গান্ধি মনে করতেন। যদিও, গান্ধির পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে সবসময়ে অহিংসার আদর্শ পুরোপুরি বজায় থাকেনি। স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে বিব্রত গান্ধি হিংসাত্মক হয়ে পড়ার ফলে আন্দোলন রদ করার নজিরও রেখেছিলেন।

> **টুকরো কথা**
> *গান্ধির স্বরাজ ভাবনা*
>
> ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *হিন্দ স্বরাজ* নামের একটি রচনায় গান্ধি তাঁর স্বরাজ বিষয়ক সামাজিক আদর্শগুলিকে স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ঐ আলোচনায় গান্ধি বলেন যে, কেবল ঔপনিবেশিক শাসন বা ব্রিটিশ সরকার নয়, পুরো পাশ্চাত্য আদর্শভিত্তিক আধুনিক শিল্পসমাজই ভারতের সাধারণ মানুষের শত্রু। গান্ধির মতে, কেবল রাজনৈতিকভাবে স্বরাজের দাবি অর্ধেক স্বাধীনতার দাবি। কারণ, তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ না থাকলেও, ব্রিটিশসুলভ ভাবনাচিন্তা থাকবে। ফলে শুধু ঔপনিবেশিক শাসনকে হটালেই হবে না। তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে যা কিছু সমাজে গড়ে উঠেছে সেগুলিও বিসর্জন দিতে হবে। গান্ধি মনে করতেন সবাইকে চাষিদের মতো সহজ-সরল জীবনযাপন করতে হবে। এই সরল জীবনযাপনের আদর্শের সঙ্গে খাদির পোশাক ও চরকা কাটার কর্মসূচিও যুক্ত হয়েছিল। যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার প্রতিই গান্ধির বিরোধিতা দেখা যায় হিন্দ স্বরাজ-এর আলোচনায়।
>
>
>
> চরকা কাটায় ব্যস্ত মহাত্মা গান্ধি

স্বাভাবিকভাবেই গান্ধির পাশ্চাত্য ও যন্ত্র-নির্ভর-সভ্যতা-বিরোধী বক্তব্য সবাই সমর্থন করেননি। বিশেষত খেয়াল করার মতো বিষয় এই যে, গান্ধি নিজেই তাঁর বক্তব্য প্রচার করার কাজে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। অথচ সংবাদপত্র

আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর-সভ্যতার একটি প্রধান নমুনা ছিল। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও গান্ধি রেলব্যবস্থার সুবিধা নিয়েছিলেন।

টুকরো কথা

চরকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

"....স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটবার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা.... সম্ভবপর নয়....।....

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে, কিন্তু সেও স্বরাজ নয়।....

....

চরকা কাটা স্বরাজসাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়।....

....

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু দিনের মতো আমাদের দেশের এক দল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এ রকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।....

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধের থেকে নেওয়া। (ে-এর ব্যবহার বাদে মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি গান্ধি নিজের ব্যক্তিত্বকেও একটা ছাঁচে রূপ দেন। হাঁটুর উপরে সাধারণ কাপড় পরা, সরল ভাষায় কথা বলা শুরু করেন তিনি। তার পাশাপাশি গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত নানা লোকধর্মের প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করেন গান্ধি। এর ফলে দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের 'আপনজন' হয়ে ওঠেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

কিন্তু, জনপ্রিয় লোকধর্মের অনুষঙ্গ ব্যবহার করার উলটো বিপদও ছিল। তুলসীদাসী রামায়ণ বা *রামরাজ্য* প্রভৃতি প্রতীক ও ধারণা বাস্তবে উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দু জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু, দেশের অনেক সংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর কাছে ঐ প্রতীকগুলির গুরুত্ব তেমন ছিল না। বরং হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের ফলে, গান্ধির আদর্শের মধ্যে একটা অংশে সর্বজনীনতা নষ্ট হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধি ভারতবর্ষে ফেরেন। এর পরবর্তী তিন বছরে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গান্ধি। অতীতে জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্ব একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচি নিত। তারপর অঞ্চল অনুযায়ী সেই কর্মসূচিগুলিকে বাস্তব রূপ দিত। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি স্থানীয় তিনটি বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিহারের চম্পারনে নীল চাষিদের অনেক দিন ধরেই নীলচাষ-বিরোধী ক্ষোভ জমা হয়েছিল। স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিরা চাষিদের বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। সেই অর্থে চম্পারনের আন্দোলনে গান্ধির ভূমিকা খানিক সীমিত ছিল। কিন্তু স্থানীয় চাষিদের কাছে গান্ধি ছিলেন রামায়ণের রামের মতো। তাঁরা মনে করতেন গান্ধি এসে যাওয়ার ফলে ঠিকা-চাষিরা আর রাক্ষস কুঠিয়ালদের ভয় করবে না। কিন্তু চম্পারনের আন্দোলন কিছু ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের নীতিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

গুজরাটের খেড়া জেলায় গান্ধিপন্থী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেখানে বাড়তি রাজস্ব কমানোর দাবিতে কৃষকরা এক জোট হন। কিন্তু নামমাত্র রাজস্ব ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ফলে খেড়ায় আন্দোলন বিশেষ সফল হয়নি। এরপর গান্ধি আমেদাবাদে মিল মালিক ও শ্রমিকদের সংঘাতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। সেখানে শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের পক্ষে গান্ধি অনশন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত দাবির থেকে কম হলেও শ্রমিকদের মজুরি খানিক বাড়ানো হয়েছিল। এইভাবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির ভূমিকা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু রাওলাট আইন চালু করাকে কেন্দ্র করে গান্ধি সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন।

টুকরো কথা

রাওলাট সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এস.এ.টি. রাওলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি দুটি বিল আইনসভায় পেশ করে। ঐ বিলদুটিতে বিপ্লবী আন্দোলন আটকানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের হাতে আরও বেশি দমনমূলক ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ঐ বিল দুটির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। ঐ বছরই ৬ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের আন্দোলন শুরু হয়। তার তিন দিন পরে গান্ধি জেলে যাওয়ার পর আন্দোলন হিংসামূলক হয়ে ওঠে।

পঞ্জাব প্রদেশে রাওলাট সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার চূড়ান্ত দমনমূলক নীতি নিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনেক মানুষ

টুকরো কথা

গান্ধি ও গুজব

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুজবের ও জনশ্রুতির একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। বস্তুত, গুজব ও জনশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রেই জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে টেনে এনেছিল। অনেক মানুষ বিশ্বাস করতেন গান্ধি একজন ক্ষমতাবান সাধুর মতো।

কৃষকেরা যেমন বিশ্বাস করতেন গান্ধি জমিদারি শোষণকে আটকাবেন। আবার আসামের চা-বাগানের কুলিরা তাদের বাগিচা ছেড়ে চলে এসে দাবি করেন তাঁরা গান্ধির আদেশ মোতাবেক কাজ করেছেন। কোথাও গান্ধি ছিলেন দেবতার মতো। বাংলায়ও উপজাতি সমাজের মানুষেরা মনে করতেন গান্ধির নাম নিলে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব আন্দোলনগুলি গান্ধির ঘোষিত মত ও পথের বাইরে এমনকী বিরোধী হয়ে পড়েছিল।

নিরস্ত্র প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। অথচ সেই নিরস্ত্র মানুষদের উপর চূড়ান্ত সন্ত্রাস চালায় সেনাবাহিনীর কমান্ডার মাইকেল ও'ডায়ার। জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি মাত্র বেরোনোর পথ ছিল। সেই পথটি আটকে রেখে প্রতিবাদী মানুষদের উপর টানা গুলি চালিয়ে যাওয়া হয়। অসংখ্য মানুষ হতাহত হন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভারতবাসীরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে *স্যর* উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

টুকরো কথা

খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কারণ, তুরস্কের সুলতান ছিলেন ইসলাম জগতের খলিফা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলিম লিগের কিছু নেতা খলিফার মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খিলাফৎ কমিটি গড়ে ওঠে। ঐ কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি।

অহিংস অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধির বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন

রাওলাট সত্যাগ্রহের পরে তিনটি প্রধান জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। সেগুলি হলো যথাক্রমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের আগে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেন গান্ধি। সেই আন্দোলনের সূত্রে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের একজোট করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল গান্ধির।

খিলাফৎ আন্দোলনের রেশ ধরেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। গোড়ার দিকে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। অনেক আইনজীবী আদালত থেকে ও মধ্যবিত্ত মানুষ সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি জাতীয় বিদ্যালয় তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে আন্দোলন অহিংস থেকে উগ্র রূপ নিতে থাকে। বিদেশি দ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি জনসমক্ষে বিদেশি কাপড় পোড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের হিংস্র চরিত্র দেখে শেষ পর্যন্ত গান্ধি আন্দোলন স্থগিত করে দেন।

টুকরো কথা

চৌরিচৌরার ঘটনা

অসহযোগ আন্দোলন সর্বত্র অহিংস ছিল না। এমনকী গান্ধি চেষ্টা করেও সবসময় জনগণকে সংযত রাখতে পারেননি। হিংসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ঐ গ্রামের স্থানীয় মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হন। ক্রমে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জনতার তাড়ায় পুলিশেরা থানায় ঢুকে পড়লে থানার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় গান্ধি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশবাসী তখনও অহিংস আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তবে জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতাই এই সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধির সমালোচনা করেছিলেন।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে কোনো বয়স্ক মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কিনা খোঁজ করো। থাকলে তাঁর/তাঁদের অভিজ্ঞতার একটি সাক্ষাৎকার নাও। পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলে তোমার বয়সি ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে কী কী জানে তার একটা সমীক্ষাপত্র তৈরি করো।

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবাসী। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

তবে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতে কাপড় আমদানির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষকেরা অনেকেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা গণহারে আন্দোলনে যোগ দেননি। তাছাড়া খিলাফৎ আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে গিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় ও দেশীয় কাপড়ের জনপ্রিয়তাও ক্রমে কমেছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়েনি। পাশাপাশি এক একটি অঞ্চলে এক একভাবে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেইসব মানুষেরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন যাঁরা আগে কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে শামিল হননি। ছাত্র-যুব সমাজ ও নারীরাও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অহিংস আন্দোলনের পর বেশ কিছু বছর নতুন গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিস্থিতি ছিল না। গান্ধি নিজে বেশ কয়েকবছর জেলে ছিলেন। তাছাড়া জেল থেকে বেরিয়েও তিনি আদর্শ সত্যাগ্রহী কর্মী তৈরিতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও নতুন বিবাদ তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে *স্বরাজ্যপন্থী* বলে একটি নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ

টুকরো কথা

স্বরাজ্য দল

কংগ্রেসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতারা গান্ধির পন্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছিলেন। তাঁদের মতে সরকারি আইন পরিষদকে বয়কট না করে তাতে অংশ নেওয়া উচিত। সেভাবে সরকারি নীতি ও কাজে বাধা দেওয়া যাবে। অন্যদিকে গান্ধিপন্থীরা পুরোনো রাস্তাতেই চলতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শেষে দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরু মিলে *কংগ্রেস-খিলাফৎ স্বরাজ্য দল* তৈরি করেন। ঐ দলটি কংগ্রেসের মধ্যেই একটি গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু আলাদা কর্মসূচি নিলেও গান্ধির পরামর্শ মতো দুই গোষ্ঠীই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যাওয়ার পর (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) গোষ্ঠীগুলি এক হয়ে যায়।

মোতিলাল নেহরু

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের সাংবিধানিক অধিকার খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন তৈরি করে। স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে ঐ কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না। ফলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করে। পাশাপাশি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা স্তরে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দেশজোড়া বিভিন্ন হরতালে কমিশনকে কালো পতাকা দেখিয়ে আওয়াজ তোলা হয়েছিল 'সাইমন ফিরে যাও'।

সাইমন কমিশন-বিরোধী গণআন্দোলন।

সাইমন কমিশন-বিরোধী উদ্যোগগুলির ফলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজ অর্জনের কথা ঘোষণা করে। গান্ধিকে সামনে রেখে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল গুজরাটের ডান্ডিতে অভিযান করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন গান্ধি। সমুদ্রের তটভূমি থেকে একমুঠো লবণ তুলে গান্ধি প্রতীকীভাবে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে অস্বীকার করেন।

তারপর দ্রুতই দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ জনতা হরতাল ও বিক্ষোভে যোগ দিতে থাকে। সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি বিদেশি দ্রব্য বয়কট করা শুরু হয়। কৃষকরা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয় সরকার। ব্যাপক সংখ্যায় নারীরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

খান আবদুল গফফর খান। মূল ছবিটি নন্দলাল বসু-র আঁকা।

টুকরো কথা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে পাঠানরা আইন অমান্য আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন অহিংস গান্ধিবাদী সংগ্রামী। তাঁদের সংগঠনটির নাম ছিল *খুদা'ই-খিদমদগার*। লাল রং-এর কুর্তা পরতেন বলে তাঁদের *লালকুর্তা বাহিনী*ও বলা হতো। গান্ধি-অনুগামী হওয়ার সুবাদে আবদুল গফফর খান *'সীমান্ত গান্ধি'* নামেও পরিচিত হন। পেশোয়ারে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সিপাহিরা অহিংস আন্দোলনকারীর উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। মণিপুরি ও নাগাদের মধ্যেও আইন অমান্য আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছিল। নাগা অঞ্চলে তরুণী রানি গিদালো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৩০-এর দশকে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে সিলেট, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

টুকরো কথা

গান্ধি-আরউইন চুক্তি

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ গান্ধি ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকে দিল্লি চুক্তিও বলে। সেই চুক্তিতে ঠিক হয় অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দিদের ব্রিটিশ সরকার ছেড়ে দেবে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা চলবে না। দমনমূলক আইনগুলি সরকার তুলে নেবে। এসবের বদলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করবে। পাশাপাশি লন্ডনে দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধি যোগ দেবেন। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় গান্ধি হতাশ হন। ফলে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকার প্রচলিত দমননীতির সাহায্য নিয়েছিল। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকেও কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় আনা হয়েছিল। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে একটি বৈঠক ডাকে। ঐ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা। কংগ্রেস ঐ বৈঠক বয়কট করে। ফলে দ্বিতীয়বার বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধিকেও ঐ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাজি করায় ব্রিটিশ সরকার। তার পাশাপাশি লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধির একটি চুক্তি হয়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি বিদেশি কাপড় বর্জন করা ও ভূমিরাজস্ব কর না দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯৩২থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ আন্দোলনের জন্য জেলে যান। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য বিশেষ সফল হয়নি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন নিঃশর্তভাবে তুলে নেওয়া হয়। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনে কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। যেমন অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছিল তেমনটা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায়নি। পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মানুষের যোগদান আইন অমান্য আন্দোলনে কম ছিল। একইভাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে শ্রমিকরাও কম যোগ দিয়েছিলেন। তবে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বেশি সংখ্যায় যুক্ত হয়েছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসও ধীরে ধীরে সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছিল। সেদিক থেকে গান্ধির স্বরাজের আদর্শ থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেস।

লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধি। মূল ছবিটি দ্য সানফ্রান্সিসকো এক্সামিনার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

১৯৩০-এর দশকে কয়েকটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান

মাস্টারদা সূর্য সেন ও জালালাবাদের যুদ্ধ

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটে। ঠিক হয় যে, একই সঙ্গে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ আর বরিশালে আক্রমণ চালানো হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়।

অস্ত্রাগার লুঠ করার পরে ২২ এপ্রিল বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। সেখানে ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে বিপ্লবীদের ১১জন নিহত হন। এরপর গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনার কর্মসূচি নিয়ে বাকি বিপ্লবীরা জালালাবাদ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। সূর্য সেনের সঙ্গে ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, হিমাংশু সেন, বিনোদ দত্ত প্রমুখ। সূর্য সেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

বিনয়

বিনয়-বাদল-দীনেশ ও অলিন্দ অভিযান

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৮ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। তাঁদের সাহায্য করলেন রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন। বিনয়,বাদল,দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দে ঢুকে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনসহ আরও দু-জনকে হত্যা করেন। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে গুলির লড়াই। শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ার আগে বাদল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ক-দিন পরে আহত বিনয়ের মৃত্যু হয়। দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁরও ফাঁসি হয়।

বাদল

ভগৎ সিং

পঞ্জাবে চন্দ্রশেখর আজাদ-এর প্রতিবাদী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির সদস্যপদ নিয়েছিলেন ভগৎ সিং। পরে ভগৎ নিজে তৈরি করেন *নওজোয়ান ভারত সভা* সংগঠন। ভগতের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ বিশমিল, আসফাকউল্লা। কাকোরি স্টেশনে রেল ডাকাতির অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে *কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা* (১৯২৫ খ্রি:) করে। এই মামলায় রামপ্রসাদ বিশমিল, আসফাকউল্লাসহ চারজনের ফাঁসি হয়।

দীনেশ

ব্রিটিশ পুলিশের হাতে নিহত লালা লাজপত রাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং লাহোরের পুলিশ সুপার স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভা কক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা ফেলেন ও দু-জনেই স্বেচ্ছায় ধরা দেন। সেই ঘটনায় বিপ্লবী রাজগুরু ও সুখদেওসহ অনেকে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ প্রশাসন এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে *লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা* শুরু করে। সেই মামলার রায়ে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেও ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক' কথাটিকে ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীরা জনপ্রিয় করেন।

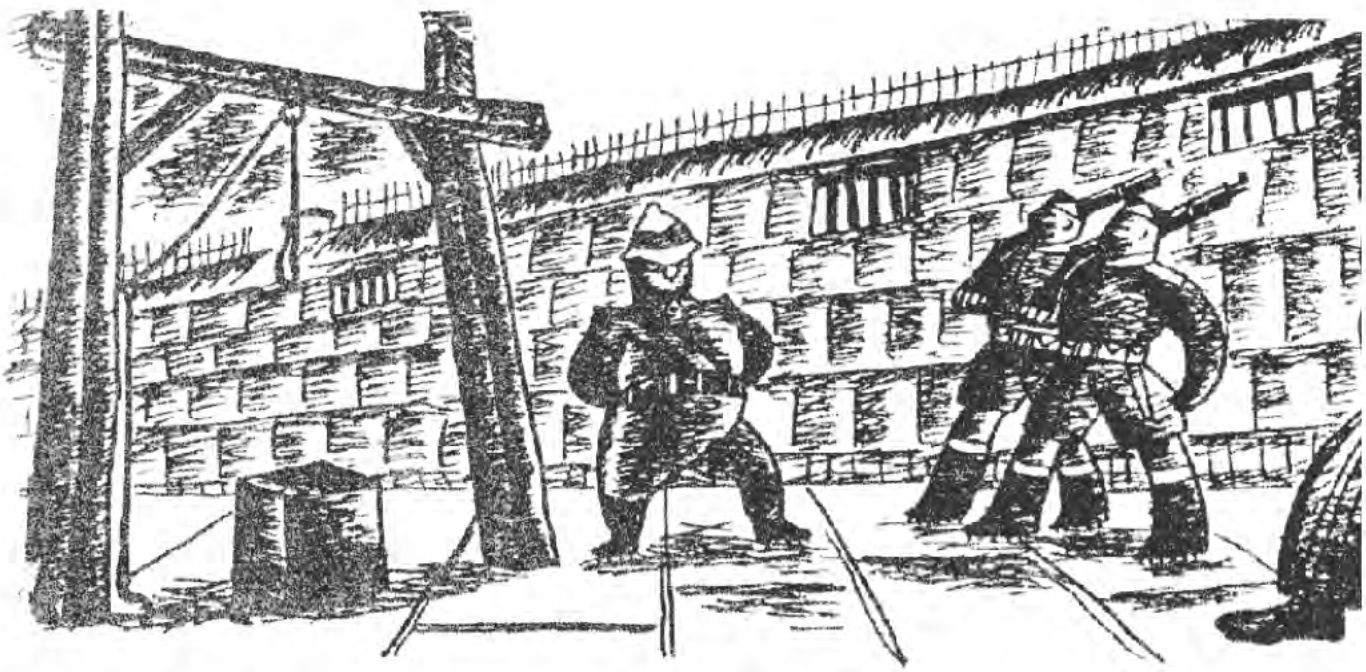

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধির অহিংস-সত্যাগ্রহের আদর্শ সবসময়ে টিকে ছিল না। গান্ধি নিজেই *'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'* ডাক দিয়ে আন্দোলনের মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি তাঁর বক্তব্য ছিল ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাক, তারপর যে পরিস্থিতিই হোক তার দায়িত্ব গান্ধি নিজে নেবেন। পাশাপাশি ভারতজোড়া আন্দোলনে নানান অংশের জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ঐ বছরে ৯ অগস্ট ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতাদের গ্রেফতার করে। সেই দিন নেতৃত্ববিহীন সাধারণ মানুষ ভারতের নানান জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। বস্তুত, নেতাহীন আন্দোলন যে অতদূর চলবে তা কংগ্রেস-নেতৃত্বও ভাবতে পারেনি।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি নানান জায়গায় জনগণের সঙ্গে পুলিশ ও সেনা বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল। শহরে ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যায়ে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। অগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে শহর থেকে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র গ্রামের দিকে সরে যেতে থাকে। ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকরা আন্দোলনে যোগ দেন। বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হয়। এমনকী কয়েকটি অঞ্চলে আন্দোলনকারীরা *'জাতীয় সরকার'* তৈরি করেছিলেন।

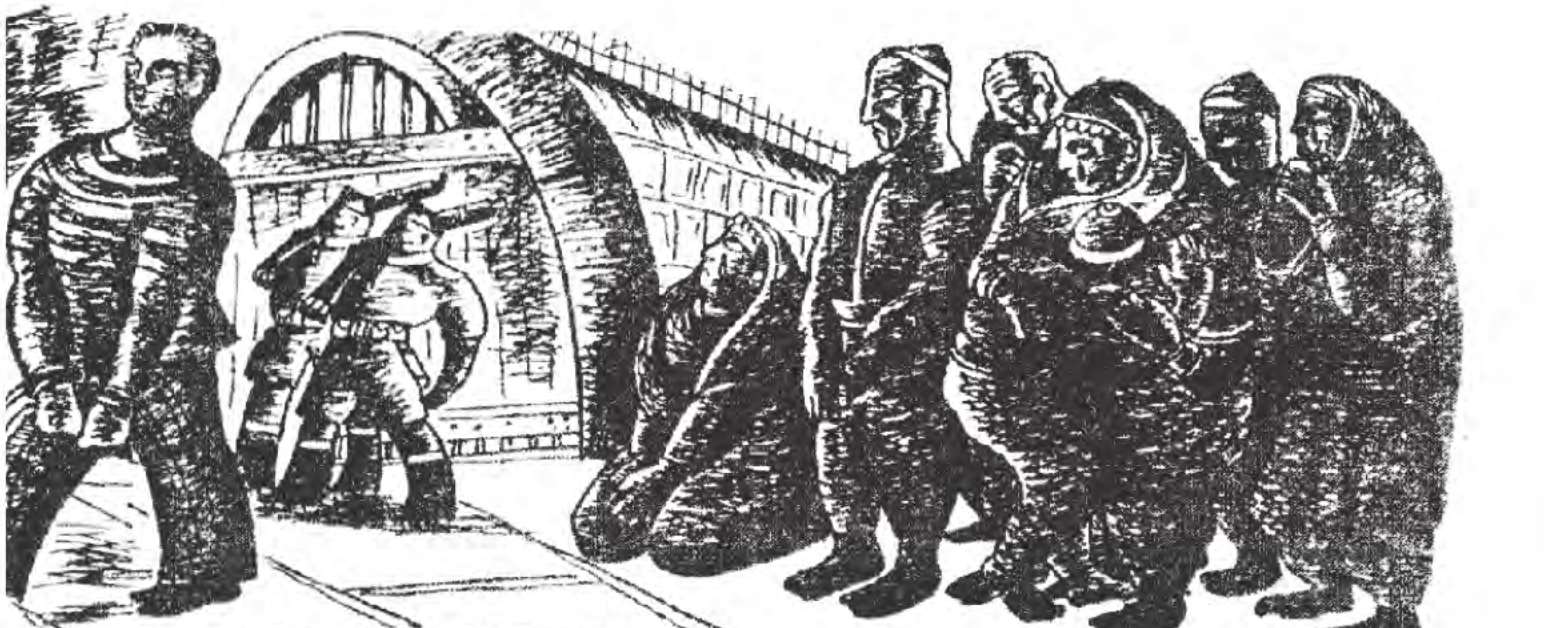

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর জনৈক মিলমালিক খাদ্যশস্য পাচার করতে গেলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘাত বাধে। তারপর থেকে তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর অনেক মানুষ মিছিল করে থানায় বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। তমলুকের বৃদ্ধা বিদ্রোহিণী মাতঙ্গিনী হাজরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান। কিছু দিন পরে ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুরের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সরকারি তরফে যথেষ্ট ত্রাণ পাঠানো হয়নি। ফলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের উদ্যোগেই দুর্গত মানুষদের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করতে থাকেন। পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিদের বাড়তি ধান গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার টিকে ছিল।

জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

মহাত্মা গান্ধি। মূল ছবিটি বাপুজি শিরোনামে নন্দলাল বসু-র আঁকা (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)

ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারের তরফে বিরাট সংখ্যক পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছিল। বাস্তবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর এত বড়ো বিদ্রোহ যে ভারতে আর হয়নি, তা ব্রিটিশ প্রশাসকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। শ্রমিকরা প্রথম দিকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ও কৃষকরাই ছিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূল শক্তি। বস্তুত, কংগ্রেসের সাংগঠনিক হিসেবনিকেশের বাইরে গিয়ে নিজেদের মতো করে কর্মসূচি তৈরি করে নিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার এই আন্দোলন দমন করতে পেরেছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসক বুঝতে পেরেছিল যে দমন-পীড়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না।

টুকরো কথা

ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে একদিকে ভারতে যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন জোরদার, অন্যদিকে পৃথিবীজুড়ে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে একদিকে ছিল জর্মানি, ইতালি ও জাপান। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতকে একতরফা 'যুদ্ধরত দেশ' বলে ঘোষণা করে দেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড জর্মান-আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জাপান জোরকদমে যুদ্ধে যোগ দিলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সাহায্য পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়াও ভারতীয়দের দাবির ব্যাপারে সহানুভূতি দেখায়। তার ফলে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি দল ভারতে আসে। ক্রিপস প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধের পর ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হবে। এদিকে যুদ্ধের ফলে খাদ্যসংকট ও মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠেছিল। গান্ধিও এই সময় ডাক দেন ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো। এহেন পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র বসু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদাই ছিলেন পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে। তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদ ছাড়া ভারতীয় সমাজের বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে। তিনি একদিকে বিংশ শতকের জর্মান-জাতীয়তাবাদী ভাবধারার শরিক হতে চেয়েছেন। তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শকেও কিছুটা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাংগঠনিক ভাবনাচিন্তাও সুভাষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিতে যোগ দেন, তখন ভারতের সাধারণ জনগণ গান্ধির নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। উচ্চবর্গের আলাপ-আলোচনার বাইরে

সাধারণ মানুষেরও যে রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, তা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধির অহিংসার আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হলেও গান্ধির নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন।

কিন্তু বিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। সে সময়ে বাংলার নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বেশ কিছু চিঠিপত্র বিনিময় হয়। সিভিল সার্ভিসে যোগদান না করে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন সুভাষ। বাংলা কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন তিনি। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় থাকার জন্য অবশ্য তাঁকে জেলে যেতে হয়।

একই জেলে থাকার সময় চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পরিচিত হন। তাই সুভাষচন্দ্রের ভাবনাচিন্তা ও কাজে চিত্তরঞ্জনের প্রভাব ছিল। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দলের সচিব ছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্বরাজ্য দলের তরফে ফরওয়ার্ড পত্রিকার অন্যতম পরিচালকের দায়িত্ব নেন সুভাষ। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জিতে যায়। চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশনের মেয়র হন। সুভাষচন্দ্র প্রধান কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব পান। এই সময়ে কর্পোরেশনের উদ্যোগে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর জন্য চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য নানারকম কর্মসূচি নেওয়া হয়। এরই মধ্যে অবশ্য সুভাষকে বারবার জেলে যেতে হয়েছিল।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র নিজের উদ্যোগে পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে তিনি নাকচ করেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে গান্ধির সঙ্গে সুভাষের সংঘাত শুরু হয়।

সুভাষচন্দ্র বসু

টুকরো কথা

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ইতিহাসের অধ্যাপক ই. এফ. ওটেনকে ঘিরে একটি ছাত্র-বিক্ষোভ হয়। তার জেরে সুভাষ ও কয়েকজন সহপাঠীকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ছাত্র থাকাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেরিটোরিয়াল আর্মির শাখায় চারমাসের জন্য যোগদান করেন সুভাষচন্দ্র। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অসামরিক জীবন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পাশাপাশি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেন। ইংল্যান্ডের ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাধীন মনোভাব ও তর্ক-বিতর্কের স্পৃহা সুভাষকে মুগ্ধ করেছিল। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুভাষ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আই.সি.এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন সুভাষচন্দ্র।

টুকরো কথা

কংগ্রেসের হরিপুরা ও ত্রিপুরি অধিবেশন

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। কিন্তু ক্রমে গান্ধি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নবীন নেতৃত্বের তিক্ততা বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরি কংগ্রেসে গান্ধি-মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পরে পদ ত্যাগ করে দলের মধ্যেই সহমর্মীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন। পারস্পরিক মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস-নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সাসপেন্ড করে। সুভাষকে কংগ্রেসের কোনো নির্বাচিত পদে লড়াই করার ক্ষেত্রে তিন-বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য শুরু হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে চিকিৎসার জন্য সুভাষকে ইউরোপ যেতে হয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে সুভাষের দেখা হয়। মুসোলিনির দুর্নীতি দূরীকরণ ও সামাজিক সেবা প্রকল্পগুলি সুভাষচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরোনো রক্ষণশীল নেতৃত্বের আন্দোলনের উপায় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ তরুণ নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ভবিষ্যতের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে যুবসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বৈপ্লবিক কর্মসূচির দাবি তুলেছিলেন। ফলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় কংগ্রেসের কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ, তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বড়ো রকমের ফাটল দেখা দেয়।

এই ঘটনার ফলে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বে রক্ষণশীলদের আধিক্য ও প্রভাব বাড়লেও সাধারণ মানুষ কংগ্রেস সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। চূড়ান্ত অসন্তোষ দেশজোড়া গণঅভ্যুত্থানের পথ তৈরি করছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সেই গণঅভ্যুত্থানের উদাহরণ।

জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে আলোচনারত মহাত্মা গান্ধি ও সুভাষচন্দ্র বসু।

টুকরো কথা

হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর আন্দোলন

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত জুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করার মনস্থ করেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে জনসংযোগ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। তবে সব জায়গায় খুব ইতিবাচক সাড়া পাননি সুভাষচন্দ্র। সেই পরিস্থিতিতে বাংলায় ফিরে সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর আন্দোলন গড়ে তোলেন। অনেকদিন ধরেই হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকেই মনে করতেন সিরাজ উদ-দৌলার নামে অপবাদ দেওয়ার জন্যই হলওয়েল ঐ কথা বলেছিলেন। ফলে হলওয়েল মনুমেন্টটিও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মানুষজন একজোট হয়। তবে, ঐ আন্দোলন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই সুভাষকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য হলওয়েল মনুমেন্টটি ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, জর্মানির হাতে ব্রিটিশশক্তির পরাজয় হবেই। তাই সেই পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিতে উদ্যোগ নেন সুভাষচন্দ্র।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানে যুদ্ধবন্দি ব্রিটিশ-বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসুর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার নেন। ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। তিনিই হন তার প্রধানমন্ত্রী ও বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

টুকরো কথা

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বান

''ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে আমি আজ হইতে আমাদের সেনাবাহিনীর সরাসরি কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলাম।

আমার পক্ষে ইহা আনন্দ ও গর্বের ব্যাপার, কারণ একজন ভারতীয়ের কাছে ভারতের মুক্তি ফৌজের (Army of Liberation) সেনাপতি হওয়া অপেক্ষা আর কোনও বড় সম্মান থাকিতে পারে না। আমি যে কার্যভার গ্রহণ করিতেছি তাহার দায়িত্ব যে কত বড় সে সম্পর্কে আমি সচেতন এবং দায়িত্বের গুরুভার আমি বোধ করিতেছি।....

আমি নিজেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর সেবক বলিয়া মনে করি। আমার কর্তব্য আমি এমনভাবে পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাহাতে আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ থাকে এবং প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর

টুকরো কথা

মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের অন্তর্ধান

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারির মধ্যরাত। কলকাতার ৩৮/২ এলগিন রোডের বসুবাড়ি থেকে দু-জন একটি গাড়ি চেপে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের একজন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। আসলে তিনি ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্র বসু। কিছুদিন যাবৎ নিজের বাড়িতে নজরবন্দি ছিলেন তিনি। অন্যজন চালকের আসনে সুভাষের ভাইপো শিশিরকুমার বসু। মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পরনে লম্বা, উঁচু-গলা কোট, ঢিলে সালওয়ার। মাথায় কালো টুপি। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা।

গোমো স্টেশনে দিল্লি-কালকা মেলে উঠে বেরিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। পেশোয়ার, কাবুল, ইতালি ও মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন জর্মানির রাজধানী বার্লিনে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়। কিন্তু বার্লিনে হিটলারের তরফে বিশেষ সাহায্য পাননি সুভাষচন্দ্র।

টুকরো কথা

রানি ঝাঁসি বাহিনী

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের যোগদানের অন্যতম নজির আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি বাহিনী। কংগ্রেসে থাকাকালীনই সুভাষচন্দ্র নারীদের সামরিক কাজে অংশগ্রহণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তিনি নারী সৈনিক তৈরি করার উদ্যোগ নেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম নেতৃত্ব রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম থেকে ঐ বাহিনীর নামকরণ হয় রানি ঝাঁসি বাহিনী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশের থেকে প্রায় ১৫০০ নারী ঐ বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইম্ফল অভিযানে রানি ঝাঁসি বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে নেমেছিল। ভারতীয় নারীদের আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বনের ধারণা প্রতিষ্ঠার পথে রানি ঝাঁসি বাহিনী প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, ন্যায় বিচার এবং নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের মুক্তি ফৌজ গঠিত হইতে পারে।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামে, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছার উপর স্বাধীন ভারতের সরকার গঠনে এবং ভারতের স্বাধীনতা চিরদিন রক্ষার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদিগকে একটি সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিতে হবে। এই সৈন্যবাহিনীর লক্ষ্য হইবে মাত্র একটি — ভারতের স্বাধীনতা লাভ, এবং ইচ্ছাও হইবে একটি — ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা।....

....

সহকর্মী, অফিসার এবং সৈন্যগণ আপনাদের অকুণ্ঠ সহায়তা এবং অটল আনুগত্যের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তি আনিতে পারিবে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে আমাদেরই চূড়ান্ত জয় হইবে।

আমাদের কার্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, ''দিল্লি চলো'' ধ্বনি করিতে করিতে আমরা সংগ্রাম করিতে থাকি। যতদিন পর্যন্ত নয়াদিল্লীর ভাইসরয়ের প্রাসাদের শীর্ষে আমাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন না হয় এবং ভারতের রাজধানীতে পুরানো লালকেল্লার ভিতরে আজাদ হিন্দ ফৌজ বিজয়সূচক কুচকাওয়াজ না করে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে।"

[২৫ আগস্ট ১৯৪৩ সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে এই নির্দেশনামাটি ঘোষণা করেছিলেন। উদ্ধৃত অংশটি সেই ঘোষণা থেকেই নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

সহযোগীদের সঙ্গে সামরিক পোশাকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।

নভেম্বর মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে জাপান-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম ব্যাটেলিয়ন রেঙ্গুন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তাঁরা। এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা অবরোধ করে। কিন্তু আজাদ হিন্দের দুই রেজিমেন্টসহ জাপানের সেনাবাহিনীর ইম্ফল অভিযান বিপর্যস্ত হয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তার ফলে বার্মা-সীমান্ত থেকে জাপান বিমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খাদ্য সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তার উপর রোগ, শীত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য প্রচুর সৈনিক মারা যায়। নানাবিধ সমস্যা ও বাধার ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান সফল হয়নি।

তবুও সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্যের আশাও তিনি করেছিলেন। জাপান সরকার সুভাষকে রাশিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু যাত্রাপথে তাইওয়ানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। বলা হয় ঐ দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসু মারা গিয়েছেন। তবে ঐ খবরটির সত্যতা সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়।

নিজে করো

উপরের মানচিত্রটি থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রাপথের একটা বিবরণ তৈরি করো।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান শেষ হলেও ভারতের রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। ঐ ফৌজের বহু সেনাকে আত্মসমর্পণের পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভারতে আনা হয়। তাঁদের বিচার শুরু হয় দিল্লির লালকেল্লায়। তাঁদের মধ্যে পি. কে. সেহগাল, জি. এস. ধিঁলো ও শাহনওয়াজ খান এই তিনজনকে 'দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগে অভিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার।

টুকরো কথা

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার ও গণবিক্ষোভ

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার চলাকালীন ভারতীয় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সরকারের কাছে তাঁরা 'দেশদ্রোহী' হলেও, ভারতীয়দের চোখে তাঁরা মহান দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিচার বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য জনসভা ও মিছিল বেরোতে থাকে। ঐ বাহিনীর অন্যতম সদস্য রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে পথে নামে বাংলার ছাত্রসমাজ। গণবিক্ষোভের আঁচ পেয়ে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা বন্দিদের পক্ষ নিয়ে আদালতে উকিল হিসেবে হাজির হন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল-মিটিংগুলি ব্রিটিশ-বিরোধী হিংসাশ্রয়ী বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সেগুলিতে যোগদান করেন। মনে রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র তাঁর ফৌজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে একসঙ্গে রেখেছিলেন। আলাদা কোনো ধর্মভিত্তিক ব্যাটেলিয়ন তৈরি করেননি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিচারাধীন বন্দিদের শাস্তি ঘোষণা হলেও, গণঅভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার পিছু হটে তিন বন্দিকে মুক্তি দেয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইয়ের প্রভাব ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের উপর পড়েছিল। অনেক সৈনিক আজাদ হিন্দ ত্রাণ তহবিলে অর্থদান করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি বা ব্রিটিশ সরকারের নৌবাহিনী প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারতের তাদের শেষের দিন যে ক্রমশই এগিয়ে আসছে তা ব্রিটিশশক্তি বুঝতে পারছিল।

টুকরো কথা

নৌ-বিদ্রোহ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের উপর আঘাত করেছিল। খাবারের খারাপ মান ও বর্ণবৈষম্যের অপমানের বিরুদ্ধে ১৮ ফেব্রুয়ারি 'তলোয়ার' জাহাজের সেনারা (Rating) ধর্মঘট করেন। তাঁদের দাবি ছিল ভালো খাবার ও বেতনে সমতা। তার পাশাপাশি আজাদ হিন্দ বাহিনী ও অন্যান্য রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিও তাঁরা তুলেছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের পতাকা তাঁরা জাহাজের মাস্তুলগুলিতে উড়িয়ে দেন।

কিন্তু ব্রিটিশ-প্রশাসন চূড়ান্ত দমননীতির মাধ্যমে নৌ-বিদ্রোহকে থামানোর চেষ্টা করে। ফলে ধর্মঘট-প্রতিবাদ দ্রুতই সংঘর্ষের রূপ পায়। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে ভারতের নানা জায়গায় ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষ পথে নামেন। অথচ কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ নৌ-বিদ্রোহীদের থেকে সমর্থন সরিয়ে নেয়। এমনকী মহাত্মা গান্ধিও ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মতোই নৌ-বিদ্রোহীরাও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদেরও ঐ একই সম্মান প্রাপ্য ছিল।

ভারতে নৌ-বিদ্রোহ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ভেবে দেখো
খুঁজে দেখো

১। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে মানানসই খুঁজে নাও :

ক) *বিবৃতি : গান্ধি পাশ্চাত্য আদর্শের বিরোধী ছিলেন।*
ব্যাখ্যা ১ : গান্ধি রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন।
ব্যাখ্যা ২ : গান্ধি মনে করতেন পাশ্চাত্য আদর্শ ভারতের প্রকৃত স্বরাজ অর্জনের পথে বাধা।
ব্যাখ্যা ৩ : গান্ধি চাইতেন ভারতের সমস্ত মানুষ সরল জীবনযাপন করুক।

খ) *বিবৃতি : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন তৈরি করা হয়েছিল।*
ব্যাখ্যা ১ : ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির প্রভাব কমানোর জন্য।
ব্যাখ্যা ২ : ব্রিটিশ-বিরোধী ক্ষোভ ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলি দমন করার জন্য।
ব্যাখ্যা ৩ : ভারতীয়দের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য।

গ) *বিবৃতি : গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন*
ব্যাখ্যা ১ : ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করার জন্য।
ব্যাখ্যা ২ : তুরস্কের সুলতানের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য।
ব্যাখ্যা ৩ : মুসলমান সমাজের উন্নতির দাবি জোরদার করার জন্য।

ঘ) *বিবৃতি : ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বর্জন করেছিল।*
ব্যাখ্যা ১ : ভারতীয়রা স্যর জন সাইমনকে পছন্দ করত না।
ব্যাখ্যা ২ : স্যর জন সাইমন ছিলেন ভারতীয়দের বিরোধী।
ব্যাখ্যা ৩ : সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না।

ঙ) *বিবৃতি : সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নেন।*
ব্যাখ্যা ১ : রাসবিহারী বসুর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য।
ব্যাখ্যা ২ : আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতীয় ভূ-খন্ডে আক্রমণ চালানোর জন্য।
ব্যাখ্যা ৩ : জাপান সরকারকে সাহায্য করার জন্য।

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	*খ-স্তম্ভ*
বিহারের চম্পারন	চিত্তরঞ্জন দাশ
স্বরাজ্য দল	অলিন্দ যুদ্ধ
বিনয়-বাদল-দীনেশ	লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা
ভগৎ সিং	কৃষক আন্দোলন
পট্টভি সীতারামাইয়া	হরিপুরা কংগ্রেস

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ শব্দ) :

ক) দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল?
খ) গান্ধির সত্যাগ্রহ আদর্শের মূল ভাবনা কী ছিল?

গ) স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলনের মূল দাবিগুলি কী ছিল?

ঘ) কাকে, কেন 'সীমান্ত গান্ধি' বলা হতো?

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা কী ছিল?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ):

ক) গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহ-র আদর্শটি ব্যাখ্যা করো। ঐ আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথমদিকের নরমপন্থীদের আদর্শের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

খ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? ঐ আন্দোলন রদ করা বিষয়ে গান্ধির সিন্ধান্তের সঙ্গে কী তুমি একমত? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) আইন অমান্য আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণের চরিত্র কেমন ছিল? সূর্য সেন ও ভগৎ সিং-এর সংগ্রাম কী গান্ধির মতামতের সহগামী ছিল?

ঘ) জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর উত্থানের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার উপর কোন কোন বিষয় ছাপ ফেলেছিল বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন কী গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ মেনে চলেছিল? নৌ-বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসেবে কীভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবে?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে):

ক) ধরো তুমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী একজন সাধারণ মানুষ। সে বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা এবং দেশে ঐ আন্দোলনে বিভিন্ন মানুষের যোগদান ও উৎসাহ বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

খ) ধরো তুমি একজন সাংবাদিক। সুভাষচন্দ্র বসু একদিন গভীর রাতে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন। নীচে তাঁর যাত্রাপথের মানচিত্র দেওয়া রইল। সেই মানচিত্র থেকে তাঁর যাত্রাপথ বিষয়ে তুমি একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখো।

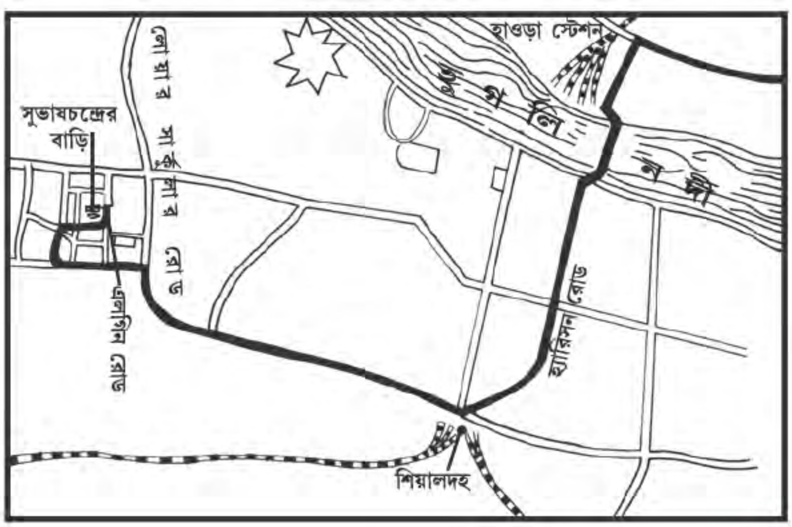

৮ সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে 'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমানরা' ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। হিন্দুস্তান বলতে তখন কেবল উত্তর ও মধ্য ভারতকেই বোঝাতো। অথচ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ঠিক ৯০ বছর পরে সেই হিন্দুস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের উপর দিয়ে চলে গেল ভারত-ভাগের সীমারেখা। বাংলাও দেশভাগের যন্ত্রনাদীর্ণ হয়ে থাকল। অথচ সুলতানি ও মুঘল আমলে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছিল। তাহলে কী এমন হলো যে ঔপনিবেশিক শাসন দেশভাগ দিয়ে শেষ হলো?

ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিকাশ

উনিশ শতকের শেষ দিকেও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সম্প্রদায় বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বোঝাত না। বরং অঞ্চলভেদে মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের তারতম্য ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার হারেও সমতা ছিল না। বাংলা ও পঞ্জাবে যেমন মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই ছিল মুসলমান। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের মধ্যে যাবতীয় বৈচিত্র্য ও তারতম্যকে মুছে দেয়। বরং ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত মুসলমানকেই একটি ধর্মসম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করতে থাকে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বদলে ধর্মীয় পরিচয়ই মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রধান পরিচয় হয়ে উঠতে থাকে। তার ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের একটা অংশ ব্রিটিশ শাসকের মতো করেই নিজেদের হিন্দুদের থেকে আলাদা একটি সংগঠিত সম্প্রদায় হিসাবে ভাবতে শুরু করে।

ভারত বিভাজনের ফলে গৃহহীন মানুষ, নতুন ঠাঁইয়ের খোঁজে। মূল ফটোগ্রাফটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট-এর তোলা।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা করে দেখত। সেই ভাবেই এক একটি সামাজিক অংশের জন্য এক একরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিত। সেই পদক্ষেপের অন্যতম ছিল আদমশুমারি বা জনগণনা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করবার তাগিদে ব্রিটিশ-নীতির পরিবর্তন ঘটল। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উৎসাহ দিয়ে ভারতীয়ত্বের ধারণাকে আঘাত করতে চেয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার। প্রশাসনের তরফে একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা হয় যে, মুসলমানরা সবাই একই রকম এবং একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

আপাতভাবে ব্রিটিশ-প্রশাসন ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল। সরকারি চাকরি, পড়াশোনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে গুরুত্ব না দেওয়ার কথাই বলা হতো। যদিও কার্যত সরকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে বড়ো করে তুলতো। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ভাগাভাগির প্রশ্নে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে বিভাজন নীতি প্রকট হতো। বিভাজনের এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা হিসাবে ফারসির বদলে ইংরেজিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার হার ছিল কম। ফলে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে। তুলনায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুরা এগিয়ে যায়। তার ফলে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই মুসলমানদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে, তারা হিন্দুদের তুলনায় বঞ্চিত। অতএব সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমান ও হিন্দুদের অবস্থান পরস্পর-বিরোধী— এই ধারণা পাকাপোক্ত হতে থাকে। যদিও মনে রাখা দরকার যে, মুসলমানদের স্বার্থ বলে যা প্রচার করা হতো তা আসলে শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থ। বিশেষত বাংলার মতো অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক গরিব ও নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদের ভালোমন্দ ঐ স্বার্থচিন্তার মধ্যে থাকত না।

মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের অভিযান শুরু হয় স্যর সৈয়দ আহমদ খান-এর আলিগড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলন ঘটিয়ে মুসলমান সমাজে আধুনিক উদার মনোভাবের বিকাশ তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্যর সৈয়দ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বা সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার উন্মাদনা তৈরি করতে চাননি। তিনি ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু আধিপত্যের উলটো দিকে মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণিকে স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী মানসিকতা গড়ে তোলা। তিনি বৃহত্তর মুসলমান সমাজের তরফে ব্রিটিশ-শাসনের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সদ্ব্যবহারের উৎসাহ তৈরির চেষ্টা করেন। তাই আলিগড়ে মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের পাঠক্রমে ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের সহাবস্থান ছিল।

টুকরো কথা

আদমশুমারি ও সম্প্রদায় ধারণা

ভারতীয় সমাজে পৃথক্‌করণের ধারণা তৈরিতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির জরুরি ভূমিকা ছিল। ঐ জনগণনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বিন্যাসের ধারণাটি পরিষ্কার হয়। পঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যার অর্ধেকই মুসলমান — সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। আদমশুমারির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার ব্যক্তির ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়কে প্রধান বলে ধরে নিয়েছিল। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের খতিয়ান রাখা হতো আদমশুমারিতে। তাই ঔপনিবেশিক ভারতে সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে ধর্মীয় এবং জাতিগত পরিচয়কেই প্রধান করে দেখতে থাকে। তার পরিণতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সংঘর্ষের পরিণতি ঘটে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উত্থানের মধ্যে দিয়ে।

স্যর সৈয়দ আহমদ জাতীয়তা-বিরোধী মানুষ ছিলেন না। কিন্তু জাতি বিষয়ে তাঁর ভাবনার সঙ্গে কংগ্রেসের ভাবনার অমিল ছিল। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সরাসরি বিরোধী ছিলেন। কেন না তাঁর ধারণা ছিল কংগ্রেস আসলে সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের প্রতিনিধি-সভা। তিনি মুসলিমদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। যদিও অন্যান্য মুসলিম নেতা যেমন, বদরুদ্দিন তৈয়াবজি কংগ্রেসেই যোগদান করেছিলেন। উত্তর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্যর সৈয়দের নেতৃত্ব সকলে মেনে নেননি। সৈয়দ আহমদের পাশ্চাত্যকরণের বিষয়টিকে উলেমা কখনোই পছন্দ করেনি। তাঁরা নিজের প্রাধান্য নষ্ট হবার আশঙ্কায় ইসলামীয় সর্বজনীনতা ও স্বাতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জামালউদ্দিন আল আফগানির মতো গোঁড়া উপনিবেশ-বিরোধী ব্যক্তিত্ব।

স্যর সৈয়দ আহমদ খান

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্যর সৈয়দ আহমদের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান-রাজনীতির ভরকেন্দ্র রূপে আলিগড় গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। সেই সময় আলিগড়ের তরুণ প্রজন্মরাও উপযুক্তভাবে সংগঠিত হয়নি। সনাতন মুসলমান সমাজকে এড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যমে নিজেদের দাবিগুলিকে সফল করে তোলার পন্থা তাঁদের অসাড় মনে হয়েছিল। বিংশ শতকের শুরুতে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির মতো তরুণ প্রজন্মের নেতারা উলেমা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে ভারতের মুসলমান রাজনীতির মধ্যে ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া জোরদার হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের থেকে মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে আছে সেই যুক্তি প্রবল হয়। অতএব সেই সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দূর করবার জন্য হিন্দু ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েরই বিরুদ্ধে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা আশু প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

বদরুদ্দিন তৈয়াবজি

টুকরো কথা

মুসলিম লিগ

বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টি নতুন করে জাতীয়তাবাদী নেতাদের নজরে পড়ে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 'পিছিয়ে পড়া' মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণির কাছে বেশ কিছু সুযোগের সম্ভবনা তুলে ধরা হয়। শিক্ষা, চাকরি, ও রাজনীতিতে সুযোগ পাবার জন্য বাংলা ও উত্তর ভারতে শিক্ষিত মুসলমানেরা একজোট হয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় *মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স*-এর অধিবেশন বসে। তখন থেকেই মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের ভাবনা জোরদার হয়। ফলে ঐ অধিবেশনেই মুসলমানদের জন্য *অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ* সংগঠন তৈরি হয়। ঐ সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি নজর রাখা। পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকার উদ্দেশ্য লিগের ছিল।

সৈয়দ জামালউদ্দিন আল আফগানি

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের সঙ্গেই লিগের কাজকর্ম চলতে থাকে। পরে অবশ্য সংগঠনদুটি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন তাঁরা লিগ তৈরির বিরোধিতা করে ছিলেন। কিন্তু সেই বিরোধিতায় বিশেষ কাজ হয়নি। বরং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লিগের প্রসার ঘটে।

প্রথম দিকের মুসলমান নেতৃবৃন্দ। ছবিটির বাঁ-দিক থেকে রয়েছেন নবাব মহসিন উল মুলক, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ মাহমুদ। সৈয়দ মাহমুদ মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এবার মুদ্রার বিপরীত দিকটিকে দেখা যাক। সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে পরস্পর-বিরোধী সেই ভাবনা তৈরি হওয়ার পিছনে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। যেমন, বাংলায় হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে অনেকসময়ই নেতিবাচক ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখা যেত। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ সম্পর্কেও বিদ্বেষ প্রকাশ পেত হিন্দু ভদ্রলোকদের লেখাপত্রে। এসবের উপর স্বদেশি নেতৃত্ব তাঁদের হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক-কেন্দ্রিক রাজনীতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন আরও প্রকট করে তোলেন। ফলে স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরেও বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘোরতর হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী নেতারা বলতে থাকেন হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাঙালি পরিচয়ের বদলে হিন্দু ও মুসলমান পরিচয় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। তার উপর বাংলার গরিব কৃষকদের বিদেশি কাপড় বয়কট করার জন্য জোর করা হয়। কাজেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন একসময় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক পর্বে স্থির করেছিল যে তারা এমন কোনো প্রস্তাব নেবে না, যা মুসলমান-স্বার্থ-বিরোধী। বহু মুসলমান কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগদান করেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি হিন্দু পুনরুজ্জীবনমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক চরমপন্থার জন্ম দেয়। এই উদ্যোগে হিন্দু ধর্মের কল্পকাহিনি এবং প্রতীক চিহ্নের মাধ্যেমে ভারতীয় জাতিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজের সংস্কারমুখী ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ঐ পুনর্জাগরণের আন্দোলন। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ ও অতিরঞ্জিত কল্পনা। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা ভারত ও হিন্দুকে সমার্থক বলে প্রচার করতে থাকেন। বলা হতে থাকে যে, মুসলমান শাসনের কারণে সেই সভ্যতার অধঃপতন ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সে সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। পুনর্জাগরণবাদীরা অবশ্য হিন্দু সংস্কারবাদীদের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী

মনোভাবকে সমর্থন করেননি। ফলে তাঁদের কাছে ইংরেজ শাসন ও উদারপন্থী সংস্কারকরা জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রধানত উঁচুজাতির সংস্কারকদের ব্রাহ্মণ্য মতানুসারী ছিল। অধিকাংশ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের বলে চিহ্নিত করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিলকের শিবাজি ও গণপতি উৎসব, অরবিন্দের দেশকে মাতৃবন্দনা ও জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে দেখা, গীতায় হাত রেখে বিপ্লবী শপথ নেওয়া প্রভৃতির কথা বলা যায়।

এসবের ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে চরমপন্থী রাজনীতির আবেদন কমে এসেছিল। এর অর্থ এই নয় যে হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবাই সচেতনভাবে মুসলমানদের দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। বরং অনেকেই দুটি সম্প্রদায়ের মিলনে দেশের অনগ্রসরতা দূর করা যাবে বলে ভাবতেন। অন্যদিকে শিক্ষিত মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু ধর্মীয় ঝোঁকের ফলে আন্দোলন থেকে দূরে সরতে শুরু করেন। নিজেদের সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ঐ মুসলমানদের অনেকেই ক্রমে রক্ষণশীল রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েন। তার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উলেমার ঘনিষ্ট সহযোগিতায় মুসলমানদের নতুন সংগঠন তৈরি হয়। পাশাপাশি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা আরও জোরদার হতে থাকে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার বদলে বিরোধিতার ভিত্তি পাকাপোক্ত হতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পথে

বিশ শতকের তরুণ মুসলমান নেতৃত্ব আগাগোড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। তবে বিংশ শতকের গোড়ায় বেশ কিছু সমস্যা তাঁদের আন্দোলনের প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ভারতীয় মুসলমানেরা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানালেও তুরস্কের বিষয়টি ঘিরে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়। তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' বা মুসলিম জগতের ধর্মগুরু মনে করা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে সুলতানের ক্ষমতা কমে যায়। তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অনেকটাই ব্রিটিশরা দখল করে। ঐ ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানেরা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা ব্রিটিশ-নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলি খলিফাকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সেই দাবি ক্রমশ ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের নেতারা দিল্লিতে এক বৈঠকে মিলিত হন। খলিফা সংক্রান্ত মুসলিম লিগের দাবিকে জোরদার করার ডাক দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে গান্ধিজি কংগ্রেসের এবং মহম্মদ আলি জিন্নাহ্,

খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে তোলা ফটোগ্রাফ। ছবিটিতে বাঁ-দিক থেকে প্রথম জন শওকত আলি এবং তৃতীয় জন মহম্মদ আলি।

ওয়াহাজিব হাসান প্রমুখরা লিগের নেতৃত্বে আসেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী গান্ধি মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ঐ বছরেই মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারবিধিতে হিন্দু ও মুসলমানের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করলে সাংবিধানিক রাজনীতিতে নেতাদের বিশ্বাস টলে যায়। ফলে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন তুরস্কের পরাজয়ে ইসলাম বিপন্ন— এই আওয়াজ তুলে গণসমর্থন তৈরি করার চেষ্টা করে। এইসব ঘটনার ফলে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটে। নরমপন্থীদের তুলনায় উলেমা ও তাদের প্রভাবাধীন আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্থান ঘটে। গান্ধিও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে কংগ্রেসের ভিত্তি প্রসারিত করার জন্য খিলাফৎ সমস্যাকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম দাবি রূপে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গান্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন করে। গান্ধি ও খিলাফতিরা একযোগে ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার কর্মসূচি প্রচার করতে থাকেন।

কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। পাশাপাশি খিলাফৎ আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। খিলাফতি নেতারা গান্ধির অহিংসা-নীতিকে ততটা গ্রহণ করেননি। বরং গান্ধির সর্বজনগ্রাহ্যতাকে ব্যবহার করে জনগণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলেন খিলাফতিরা। উলেমাদের উপস্থিতি ও ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার ইসলামীয় আন্দোলন ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। ফলে খিলাফৎ আন্দোলনে হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯২২-'২৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েক জায়গায় দাঙ্গা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মধ্যে ভাঙন ঘটায়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের খলিফা পদের অবসান ঘটে। তার ফলে খিলাফৎ আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে মুসলিম লিগের কর্মসূচিতে ছাপ ফেলেছিল। পাশাপাশি সমানভাবে বাড়তে থাকে উগ্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। এই সময় হিন্দু মহাসভার মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির শক্তি বাড়তে থাকে। কংগ্রেসের সঙ্গে এই সংগঠনগুলির ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়। মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতাদের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী কার্যকলাপ কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করায় মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশ কংগ্রেসের থেকে আরও দূরে সরতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও মহম্মদ আলির মতো সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সমর্থক নেতারাও কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

মদনমোহন মালব্য

উগ্রহিন্দু নেতাদের চাপে মোতিলাল নেহরুর মতো স্বরাজ্যপন্থী নেতারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ও স্বরাজ্য পন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পঞ্জাবে

কংগ্রেসের মধ্যে কোনো মুসলমান প্রার্থী ছিল না। ফলে শওকত আলির মতো সম্প্রীতিবাদী নেতারাও কংগ্রেসের মধ্যে উগ্র হিন্দু মতামতের বাড়বাড়ন্তে হতাশ হয়ে পড়েন। এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানদের কম অংশগ্রহণের মধ্যে। জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সরে থাকার ঐ প্রবণতাকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ১৯৩০-এর দশকেও রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে আলাদা আলাদা অবস্থান ছিল। ফলে 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা' বলে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানকে চিহ্নিত করা ইতিহাসগতভাবে ভুল।

১৯৩০-এর দশক দ্বি-জাতি তত্ত্বভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের সভাপতি মহম্মদ ইকবাল এবং পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমৎ আলি পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও কাশ্মীর নিয়ে মুসলমানদের আলাদা ভূ-খণ্ড গঠন করার প্রস্তাব দেন। রহমৎ আলি অস্পষ্টভাবে 'পাকিস্তান'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা বলা হয়। সেই ঘোষাণায় ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন ও শাসন নীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। ঐ ঘোষণা মোতাবেক প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিধানমণ্ডলীতে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয়। সেগুলিতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন করার কথা ওঠে। কংগ্রেস এই ধরনের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিল। কারণ তার ফলে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের বদলে সাম্প্রদায়িক ভাবনাকেই উৎসাহ দেওয়া হত। ভারতের সাধারণ স্বার্থের বদলে ভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থই বড়ো হয়ে উঠবে সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে কংগ্রেস।

ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫ খ্রি:) মোতাবেক প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য পেলেও, লিগ ততটা ভালো ফল করতে পারেননি। মুসলমান জনসংখ্যা-প্রধান পঞ্জাব, বাংলা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধ প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা তৈরি হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। জিন্নাহ্‌ও সেই বছরে প্রথম দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন। যদিও আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তখনও ওঠেনি। বরং আইনসভায় হিন্দু-মুসলমান সমতার দাবি গুরুত্ব পেয়েছিল। জিন্নাহ্‌র বক্তব্য ছিল ভবিষ্যতে সাংবিধানিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে মুসলমান জাতির মতামতকে অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না।

টুকরো কথা
মহম্মদ ইকবাল

আধুনিক ভারতের একজন বিখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবাল। তরুণ প্রজন্মের মুসলিম ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবনাকে তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে গভীর ভাবে আলোড়িত করেন। মানবতাবাদী ইকবাল মনে করতেন ভালো কাজ মানুষকে অমরত্ব ও শান্তি দেয়। আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্য আর অন্যায় মেনে নেওয়া তাঁর কাছে ছিল পাপ কাজের নামান্তর। '*সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হমারা*' ইত্যাদি বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কবিতা ইকবালের রচনা। যদিও শেষের দিকে তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

টুকরো কথা

পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সভাপতিত্ব করেন। ঐ অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক জাতি হিসেবে আলাদা একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের দাবি উঠে আসে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমৎ আলি ১৯৩৩-'৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। যদিও লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক যে রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি ছিল তাতে 'পাকিস্তান' নামের উল্লেখ ছিল না। এই প্রস্তাবটির খসড়া তৈরিতে সিকন্দার হায়াৎ খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফজলুল হক সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ কর্তৃক গৃহীত মুসলমানদের জন্য পৃথক স্বশাসিত রাষ্ট্রের এই প্রস্তাবই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ। ছবিটির বাঁ-দিকে রয়েছেন চৌধুরি রহমৎ আলি। মধ্যের জন মহম্মদ ইকবাল। ডান দিকের জন খাজা আবদুল রহিম।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অগস্ট ঘোষণায় লর্ড লিনলিথগো প্রথম মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে কোন সমঝোতা হলে মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই মানতে অস্বীকার করে। সেই বছরেই ৮ অগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা হয়। লিগ সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। যখন প্রায় সব প্রধান কংগ্রেসি নেতাই জেলে বন্দি তখন পাকিস্তানের ধারণাটিকে ব্যাপক প্রচার করা হয়। এ কথা প্রকাশ্যে বলা হতে লাগল যে লিগকে সমর্থন করার অর্থ ইসলামকে সমর্থন করা। বহু মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র পাকিস্তান গঠনের দাবিকে সমর্থন জানাতে লাগল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসি নেতা সি. রাজাগোপালাচারী জিন্নাহ্‌র কাছে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায়, জিন্নাহ্ ঐ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিমলা অধিবেশনে লিগ নিজেকে সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে। কংগ্রেস সেই সময়েই ঐ দাবিতে আপত্তি জানায়। লর্ড ওয়াভেলের সভাপতিত্বে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সিমলায় বৈঠক হয়। সেখানে সমতার দাবিতে জিন্নাহ্ অনড় থাকায় সেই বৈঠকও ভেস্তে যায়। মুসলিম জনগণের বিভিন্ন অংশের মানুষদের কাছ থেকে আলাদা হবার প্রচারে সাড়া পাওয়া যেতে থাকে। বিশেষ করে পেশাদার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের কাছে পাকিস্তানের অর্থ ছিল হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিযোগিতার অবসান। এর সঙ্গে পির ও উলেমাও পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন ও ধর্মীয় বৈধতা দেয়।

নিজে করো

তোমার ক্লাসে দুটি দল তৈরি করে ভারত-বিভাজন অনিবার্য ছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্কসভা আয়োজন করো।

এ. কে. ফজলুল হক

তবে মনে রাখা দরকার মুসলিম লিগ মোটেই ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত ধরনের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করত না। বাংলায় এ. কে. ফজলুল হক-এর *কৃষক প্রজা পার্টি* নীচু জাতির হিন্দু ও মুসলমান উভয় কৃষকদের স্বার্থের পক্ষেই সওয়াল

করত। এমনকি মুসলিম ভোট নিয়ে লিগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির লড়াইও চলেছিল। বস্তুত, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের বাইরে অধিকাংশ অঞ্চলেই লিগের বিশেষ প্রভাব ছিল না। বাংলায় ফজলুল হক-এর কৃষক প্রজা পার্টি বা পঞ্জাবে স্যর সিকন্দর হায়াৎ খান-এর *ইউনিয়নিস্ট পার্টি* আলাদা রাষ্ট্রের দাবিকে জোরদার করেনি। তবে ক্রমশ মুসলমান-সমাজে এই পার্টিগুলির ভিত্তি দুর্বল হতে থাকলে, সেই শূন্যতা ভরাট করে মুসলিম লিগ। বাংলা ও পঞ্জাব উভয় প্রদেশের কৃষকদের মধ্যে মুসলিম লিগের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। অবশ্য কংগ্রেস বারবার সেই সত্যটা অস্বীকার করতে চেয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বাংলা, সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্জাব বাদে প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু এই ফলাফল লিগের মধ্যে আশঙ্কার জন্ম দেয়। ভারতের রাজনীতির একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেস— এরকম প্রচার হতে পারে বলে ভেবে নেয় মুসলিম লিগ। ফলে লিগের দাবিতে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিলেও, মুসলিম লিগ তাতে অসম্মত হয়। ১৬ আগস্ট থেকে পাকিস্তানের জন্য গণআন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ দিনে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যই পূর্ববঙ্গ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় মারাত্মক সংঘর্ষ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসে নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসনে অবস্থান বজায় রাখতে লিগ যোগ দিতে সম্মত হয় এবং পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠায়। ভারতীয় গণপরিষদ ডিসেম্বর মাসে তার প্রথম সভা করে। কংগ্রেস পরিষদকে সার্বভৌম মনে করলেও, লিগ সেই মত মানতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে। ব্রিটিশ সরকার ঐসব দাঙ্গা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। এই দুঃসময় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেস ও লিগ-নেতৃত্ব ভারত বিভাজনকে একমাত্র উপায় মনে করে। ফলে ভি. পি. মেনন ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর পরিকল্পিত খসড়াকে ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করে। ঐ খসড়া কংগ্রেস ও লিগের কাছে পেশ করা হয়। দুটি রাজনৈতিক দলই সেই প্রস্তাব মেনে নেয়। ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুমোদন করে। সেই মোতাবেক ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এবং ১৫ অগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও মহাত্মা গান্ধি। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ

টুকরো কথা
র‍্যাডক্লিফ লাইন

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অনেক টানাপোড়েনের পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লিগ মেনে নেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ও পঞ্জাবকে ভাগ করার জন্য দুটি পৃথক সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয়। দুটি কমিশনেই লিগ ও কংগ্রেস থেকে দু-জন করে সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজীবী স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ দুটি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১২ জুলাই কার্যভার গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে র‍্যাডক্লিফ ভারতের বিভাজন মানচিত্র (র‍্যাডক্লিফ লাইন) তৈরি করেন। ঐ বিভাজন মানচিত্র ভারতের বহু মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। র‍্যাডক্লিফ লাইন অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তৈরি করা হয়। র‍্যাডক্লিফের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। অনেক এলাকার মানচিত্র র‍্যাডক্লিফ নির্ধারণ করে ছিলেন, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। সর্বোপরি, বাংলা ও পঞ্জাব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হয়নি। সমস্ত সাধরণ মানুষ আদৌ দেশভাগ চেয়েছিল কি না— সেই মতামতের কোনো মূল্য কারোর কাছেই ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের কাছেও জরুরি ছিল কংগ্রেস ও লিগ দেশভাগে সম্মত হয়েছে। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পাশাপাশি বীভৎস দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু জীবন স্বাধীনতাকে কালিমালিপ্ত করেছিল।

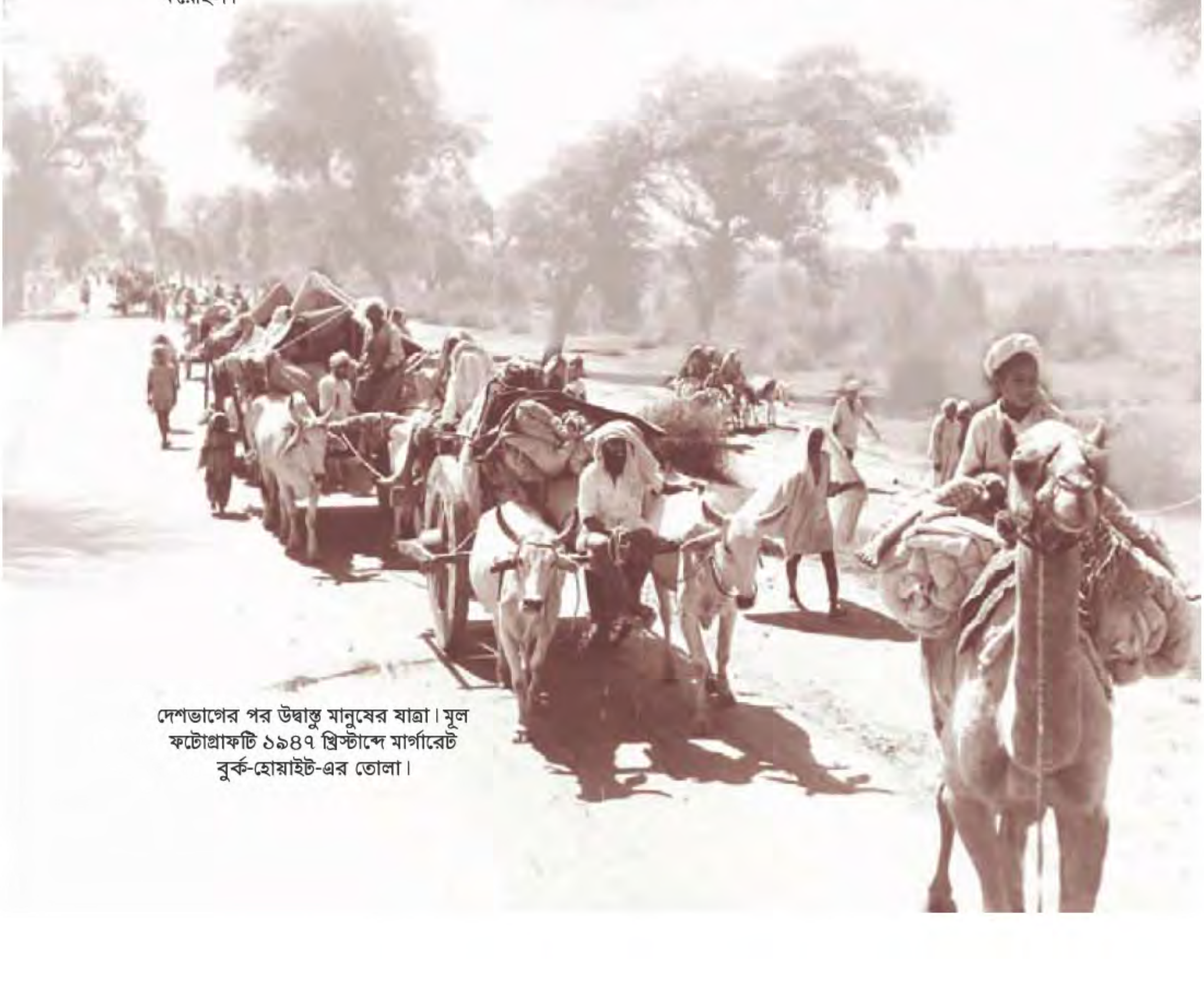

দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষের যাত্রা। মূল ফটোগ্রাফটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট-এর তোলা।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট
মধ্যরাতে ভারত
কাশ্মীর
উত্তর
পঞ্জাবের রাজ্য
রামপুর
রাজপুতানা
গোয়ালিয়র
বেনারস
মণিপুর
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য
পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য
দিউ
দমন
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
হায়দরাবাদ
কোলহাপুর
গোয়া
মহিশূর
ত্রিবাঙ্কুর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল
দেশীয় রাজ্যসমূহ
পোর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চল
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো
খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসির বদলে ইংরেজিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ________ (১৮৪৭/১৮৩৭/১৮৫০) খ্রিস্টাব্দে।

খ) ভারতের মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের অভিযান প্রথম শুরু করেছিলেন ________ (মহম্মদ আলি জিন্নাহ্/ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ/স্যর সৈয়দ আহমদ খান)।

গ) কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ছিলেন ________ (এ. কে. ফজলুল হক /মহম্মদ আলি জিন্নাহ্/ জওহরলাল নেহরু)।

ঘ) স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ________ (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট/১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট /১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) উনিশ শতকে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।

খ) হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল।

গ) মহাত্মা গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি।

ঘ) পাকিস্তান প্রস্তাব তোলা হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) আলিগড় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

খ) স্বদেশি আন্দোলন বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

গ) ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন কেন?

ঘ) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :

ক) স্যর সৈয়দ আহমদ খান কীভাবে মুসলমান সমাজকে আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করো।

খ) কীভাবে উনিশ শতকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল? সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরিতে ঐসব আন্দোলনগুলির ভূমিকা কী ছিল?

গ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরে কীভাবে মুসলমান নেতাদের অনেকের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল?

ঘ) ১৯৪০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কীভাবে ভারত-ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল? তোমার কী মনে হয় ভারত বিভাগ সত্যিই অপরিহার্য ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

মনে করো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তুমি ভারত-ভাগের কথা জানতে পারলে। তোমাকে তোমার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

৯ ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। অনেক ক্ষয়ক্ষতি, দেশভাগ শেষে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হলো। পলাশির যুদ্ধ থেকে ধরলে ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলো ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। কিন্তু অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। সেই সবের মধ্যেই কাজ করে চলেছিল সংবিধান সভা। বানানো হচ্ছিল স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার শেষে তৈরি হলো ভারতের সংবিধান। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গ্রহণ করা হলো সংবিধানটি। পরের বছরে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতে কার্যকর হলো সংবিধান।

সংবিধান বলতে বোঝায় কতকগুলি আইনের সমষ্টি। সেই আইন মোতাবেক কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধানের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের নিরিখে সংবিধান হলো সেইসব আইনকানুন, যার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিকদের অধিকার এবং সরকার-নাগরিকদের সম্পর্ক পরিচালিত হয়। সংবিধান একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল তখন ব্রিটিশ সরকারের আইন মোতাবেক ভারত শাসন করা হতো। সেখানে ভারতীয়দের চাওয়া-পাওয়ার কোনো প্রতিফলন ঘটত না। তাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতীয়দের জন্য একটি সংবিধান রচনার দাবি তুলতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীর কিছু কিছু দাবি মেনে নিলেও প্রশাসনের মূল নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের হাতেই রেখেছিল।

তবে ক্রমাগত আন্দোলনের চাপে ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও সংবিধানের দাবিকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ সভার কাজ হবে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা।

স্বাধীন ভারতের সংসদ ভবন, নয়া দিল্লি।

> **টুকরো কথা**
> *সাধারণতন্ত্র দিবস*
> ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতকে *সাধারণতন্ত্র* বলে ঘোষণা করা হয়। তাই ঐ দিনটিতে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ভারতবর্ষের সংবিধান বিশ্বের সবথেকে বড়ো সংবিধান। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি ভারতের সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের থেকে মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, আয়ারল্যান্ডের থেকে নির্দেশমূলকনীতি ইত্যাদি।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠিত হয়। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়। বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সাতজনের খসড়া কমিটি সংবিধান রচনার কাজটি করেছিল।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনাকে 'সংবিধানের বিবেক' বা 'সংবিধানের আত্মা' বলা হয়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র' বলা হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই আদর্শদুটি যুক্ত করে ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বলা হয়েছে। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

সার্বভৌম বলতে বোঝায় ভারতরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। বিদেশি কোন রাষ্ট্র বা সংস্থার আদেশ, নির্দেশ বা অনুরোধ ভারত মানতে বাধ্য নয়।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা। মূল পৃষ্ঠাটির অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল বসু।

সমাজতন্ত্র বলতে সাধারণত উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর রাষ্ট্র তথা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদিত সম্পদের সমান ভাগকে বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে অন্য অর্থে। সেখানে মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানা-নির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে,

ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝানো হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। বিশেষ কোনো ধর্মের হয়ে কথা বলা বা বিরোধিতা করা কোনটাই রাষ্ট্র করবে না। প্রত্যেক নাগরিক তাঁর নিজের বিশ্বাস মতো ধর্মাচরণ করতে পারবেন।

ব্যাপক অর্থে *গণতন্ত্র* বলতে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র বলতে মূলত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোট দিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আইনসভায় এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় ভারতের শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক কোনো রাজা বা রানির স্থান নেই। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনিও ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস ও রক্ষক ভারতীয় জনগণ। সেজন্য ভারতীয় সংবিধানে সাধারণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে কেন্দ্রের শাসনবিভাগ গঠিত হয়। আইন এবং তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের শাসনবিভাগের প্রধান। যদিও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদই রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রপতি

ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। রাষ্ট্রপতি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ পদ্ধতিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। একই ব্যক্তি একাধিক বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হতে গেলে ঐ ব্যক্তিকে কমপক্ষে ৩৫বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এবং লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। সরকারি কোনো লাভজনক পদে তিনি নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

উপরাষ্ট্রপতি

পদমর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান। উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে গেলে কমপক্ষে ৩৫বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এবং রাজ্যসভায় সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। উপরাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রপতির মতোই এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল সাধারণত পাঁচ বছর।

কেন্দ্রীয় আইনসভা

রাষ্ট্রপতি ও দুইকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ গঠিত। কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন রচনা, সংবিধান সংশোধন, করের হার নির্দিষ্ট করা—প্রভৃতি নানা কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষকে বলা হয় রাজ্যসভা। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অনধিক ২৫০জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয়। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে বিজ্ঞান চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ১২জন ভারতীয় নাগরিককে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অন্তত ৩০ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। রাজ্যসভার সদস্যরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

মনে রেখো

ইংল্যান্ডের রানির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের শাসন বিভাগের নামমাত্র প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ও ভূমিকার কোনো মিল নেই। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা লোকসভার প্রায় সকল সদস্য নির্বাচিত হন। কেবল রাষ্ট্রপতি দু-জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। সংবিধানে বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৫২ করা হয়েছে।

লোকসভার সদস্যপদে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। ঐ ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্য-সরকারের অধীনে চাকরিরত থাকতে পারবেন না। লোকসভার সদস্যরা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ বা স্পিকার। অধ্যক্ষের অবর্তমানে উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পিকার সভার কাজ পরিচালনা করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ উভয়েই লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে এবং সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। তিনি হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান। রাষ্ট্রপতি দেশের সাংবিধানিক প্রধান হলেও, প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচালক।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

লোকসভা নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। কোনো দল বা জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে, তখন রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করে লোকসভার সদস্যদের মধ্যে কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে কিছুদিনের মধ্যে লোকসভায় বেশিরভাগ সদস্যের সমর্থন অর্জন করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী একাধিক দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে পারেন। তাঁর পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

রাজ্যের আইনসভা

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে আইনসভা রয়েছে। কোনো কোনো রাজ্যের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। আবার কোনো রাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। যে সমস্ত রাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট তার উচ্চকক্ষের নাম বিধানপরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম বিধানসভা। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট, শুধু বিধানসভা নিয়ে গঠিত। রাজ্যপাল, বিধানসভা এবং বিধানপরিষদ অথবা কেবল রাজ্যপাল ও বিধানসভা নিয়ে রাজ্য আইনসভা গঠিত হয়।

রাজ্যপাল

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সবার উপরে রাজ্যপালের স্থান। যদিও তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা নামমাত্র প্রধান। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি রাজ্যের জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন না।

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হতে হলে ঐ ব্যক্তিকে অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে চাকরি বা কোনো লাভজনক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

রাজ্যের রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত পদে ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যে বিধানপরিষদ থাকলে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে রাজ্যপাল সেখানে নিয়োগ করেন।

বিধানসভা

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে বিধানপরিষদকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য আইনসভায় কেবল বিধানসভা রয়েছে। বিধানসভার প্রায় সব সদস্য বা বিধায়কগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। কেবল কোনো কোনো বিধানসভায় একজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য রাজ্যপালের ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত হতে পারেন। বিধানসভার সদস্যদের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর।

মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রের মতো ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সংসদীয় সরকার রয়েছে। সেই সরকারের প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে সাহায্য করার ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য রাজ্যে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। ঐ মন্ত্রীসভার প্রধান হবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা তাঁদের কার্যাবলির জন্য বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে স্বায়ত্তশাসন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ জনগণ তাঁদের স্থানীয় অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় সরাসরি অংশ নিতে পারেন। তাঁরা নিজেরাই গ্রাম ও শহরের শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করতে পারেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় মানুষজন প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। তার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হয়।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রামীণ ও পৌর দুটি ভাগে বিভক্ত। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা *পঞ্চায়েত ব্যবস্থা* নামে পরিচিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়

তিনটি স্তর রয়েছে। সবথেকে নীচের স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। তার উপরে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। তারও উপরে রয়েছে জেলা পরিষদ।

গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কতকগুলি পরপর সংলগ্ন গ্রাম বা গ্রামের সমষ্টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা নির্ধারিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ভোটার হতে হবে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চাকরিজীবী কোনো ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে পারেন না। পঞ্চায়েতের সদস্যরা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পঞ্চায়েত প্রধান ও আর একজনকে উপপ্রধান নির্বাচন করেন। বর্তমানে প্রধান এবং উপপ্রধান পদটি এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকাল সাধারণত পাঁচ বছর তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার তার মেয়াদ ছয় মাস বাড়াতে পারে। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রতিমাসে অন্তত একবার পঞ্চায়েতের সভা ডাকা বাধ্যতামূলক। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় সাধারণত সভাপতিত্ব করেন গ্রাম প্রধান।

পঞ্চায়েত সমিতি

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর হলো পঞ্চায়েত সমিতি। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক তৈরি হয়। সেই ব্লকের নাম অনুসারে নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নামকরণ করা হয়। ব্লক উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং কোনো মহিলা সদস্য না থাকলে, সেক্ষেত্রে সরকার তাঁদের মধ্য থেকে সর্বাধিক দু-জন সদস্য নিয়োগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবন, কলকাতা।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীর সমান যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো পঞ্চায়েত সমিতির মেয়াদও ছয় মাস বাড়াতে পারে। পঞ্চায়েত আইনে প্রতি তিনমাস অন্তর সমিতির সভা ডাকার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন। সমিতির সভায় সভাপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি ও সহসভাপতির পদটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতোই এক-তৃতীয়াংশ মহিলা এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত।

জেলা পরিষদ

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে কলকাতা ও দার্জিলিং বাদে প্রত্যেকটি জেলায় জেলা পরিষদ রয়েছে। জেলা পরিষদে প্রার্থী হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তির গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর সমতুল্য যোগ্যতা থাকা দরকার।

জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এর কার্যকাল কিছুটা সময় বাড়ানো যায়। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তিনমাসে অন্তত একবার অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক। জেলা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাধিপতি। সভাধিপতির অবর্তমানে সহসভাধিপতি সভার এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনা করেন।

জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সভাধিপতি ও আর একজনকে সহসভাধিপতি নির্বাচন করেন। সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত। নিজপদে থাকাকালীন কোনো লাভজনক সংস্থা, ব্যবসা ও পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারেন না।

পৌরসভা

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ পৌরসভা। রাজ্য সরকার প্রতিটি পৌর অঞ্চলকে কতগুলি *ওয়ার্ড*-এ ভাগ করতে পারেন। সেই প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পৌরসভার সদস্যদের বলে কাউন্সিলর। কোনো ব্যক্তি ঐ এলাকার ভোটদাতা হলেই এলাকার কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বাকি যোগ্যতা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের যোগ্যতার মতোই। পৌর এলাকার নির্বাচিত কাউন্সিলরদের নিয়ে তৈরি কাউন্সিলর পরিষদকেই *পৌরসভা* বলা হয়। ঐ পরিষদের কাজের মেয়াদ হলো পাঁচ বছর। কাউন্সিলর পরিষদ নিজেদের মধ্যে থেকেই একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচন করেন।

নিজে করো

তোমারস্থানীয় অঞ্চলেরস্বায়ত্তশাস ন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি চার্ট বানাও। পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলে স মীক্ষা করো যে কীভাবে ঐ অঞ্চলের আরও উন্নতি করার যেতে পারে বলে অঞ্চলের বাসি ন্দারা মনে করছেন।

সামাজিক উন্নয়নে সংবিধানের ভূমিকা

ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা আছে। তবুও নারী ও পুরুষকে সমাজে সমান চোখে দেখা হয় না। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েরা পরিবারে ও সমাজে নানা অবহেলার শিকার হয়। জন্মানোর পর কন্যাসন্তানদের অবহেলা ও পীড়নের শিকার হতে হয়। বিয়ের সময় চলে পণ দেওয়া-নেওয়ার প্রথা। তাছাড়া নারী পাচারের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে চলে।

নারীদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া এইসব অমানবিক ঘটনা রুখতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নারীদের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য বেশ কিছু আইনও বলবৎ করা হয়েছে। সেই আইনগুলি ভারতের সংবিধানের অন্তর্গত।

পাশাপাশি নারীদের শিক্ষার প্রসারের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদেরও পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ তৈরি হয়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানগতভাবে বলা হয়েছে যে, জমি ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।

টুকরো কথা

পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনের উদ্যোগে ভারতে পৌরশাসন ব্যাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় পৌরআইন তৈরি হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর সেই আইন মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গেও পৌরসভাগুলি পরিচালিত হতো। পরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পৌরশাসন ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পৌরবিল তৈরি হয়েছিল। পরের বছর সেই বিলটি আইন হিসেবে কার্যকর হয়।

টুকরো কথা

পারিবারিক হিংসারোধ আইন-২০০৫

পরিবার এবং সমাজে বাস করতে গিয়ে নারীদের নানা বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়। সেসবের প্রতিকারের বিধানও ভারতের সংবিধানে আছে। এমনই একটি আইন হলো *পারিবারিক হিংসারোধ আইন - ২০০৫*। পরিবারের কোনো মহিলা যদি কোনো ঘটনায় নিপীড়নের শিকার হন, তাহলে তিনি এই আইনে সুরক্ষা পেতে পারেন।

এই আইন মোতাবেক মেয়েরা অত্যাচারিত হলে সে বিষয়ে মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারকের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। এছাড়া প্রতিটি জেলার সুরক্ষা আধিকারিক (Protection Officer)-এর কাছেও এ ব্যাপারে আবেদন করা যায়। সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পাওয়া যায়। পারিবারিক হিংসারোধ আইনের আওতায় অন্যান্য কতকগুলি বিষয় রয়েছে। যেমন, মানসিক পীড়ন ও অর্থনৈতিক পীড়ন ইত্যাদি। তবে শুধু আইন প্রণয়ন করেই এধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই সমাজে সার্বিক শিক্ষার বিকাশ ও নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে ফলপ্রসূ করা প্রয়োজন।

অনগ্রসর নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ভূমিকা

ভারতের জনসমাজের একটা বড়ো অংশ ঔপনিবেশিক আমলে *'পশ্চাদপদ শ্রেণি'* বলে পরিচিত হতেন। মূলত সামাজিকভাবে 'অস্পৃশ্য' মানুষেরাই ঐ পরিচয়ের মধ্যে পড়তেন। তাছাড়া তাঁদের *'তফশিলি জাতি'*, *'হরিজন'* ও *'দলিত'* প্রভৃতি বলেও উল্লেখ করা হতো। বস্তুত এই সমস্ত শব্দগুলি দিয়ে ভারতীয় সমাজে ঐ সব মানুষের সামাজিক অবস্থান বোঝানো হতো। ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতের দলিত-সমাজ নিজেদের অধিকারের প্রসঙ্গে সচেতন হতে থাকেন।

মনে রেখো

প্রতিটি শিশু, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জন্মায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে শিশুরা নানা অত্যাচারের শিকার হয়। শিশুদের অধিকার রক্ষার কথাও সংবিধানে আছে।

সামাজিক অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে স্বরাজ অর্জনের জরুরি শর্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি। যদিও অসহযোগ আন্দোলন মিটে যাওয়ার পরে গান্ধির অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে কারোরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। গান্ধি মূলত হিন্দু মন্দিরে হরিজনদের ঢুকতে পারার অধিকার নিয়েই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ধর্মীয় অধিকার পেলেও, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে হরিজনরা বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন। তাই সামাজিকভাবেও হরিজনদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল রূপকার বি. আর. আম্বেদকর।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে গান্ধির কর্মসূচির সঙ্গে বি. আর. আম্বেদকরের মতামতের পার্থক্য হয়েছিল। আম্বেদকর চেয়েছিলেন শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও দলিতদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে। ক্রমেই দলিতদের আলাদা রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে দেখার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন আম্বেদকর দাবি করেন দলিত সমাজের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য তাদের আলাদা নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি আম্বেদকরের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দলিত মানুষদের তফশিলি জাতি হিসাবে আলাদা নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। তার প্রতিবাদে গান্ধি আমরণ অনশন করেন। ফলে বাধ্য হয়ে আম্বেদকর গান্ধিকে অনশন তুলে নিতে অনুরোধ করেন। গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে একটি চুক্তি (পুনা চুক্তি) হয়। সেই চুক্তি অনুসারে দলিতদের আলাদা নির্বাচনের বদলে যৌথ নির্বাচনেই তফশিলি জাতির জন্য ১৫১টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু দ্রুতই দেখা যায় হরিজন বিষয়ে গান্ধির কর্মসূচিতে কংগ্রেসি নেতৃত্বের বিশেষ উৎসাহ নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই জাতপাতের বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন কংগ্রেসের অনেক নেতা। ফলে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলিত-সমাজের আন্দোলন চলতেই থাকে। কিন্তু, তফশিলি সম্প্রদায়গুলি নিজেদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতার হস্তান্তরের ফলে তফশিলি সম্প্রদায়ের আন্দোলন এগোতে পারেনি।

অন্যদিকে, কংগ্রেসও ক্রমে তফশিলি সম্প্রদায়ের দাবিগুলির প্রতি আপাতভাবে সহমর্মী অবস্থান নিয়েছিল। সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আম্বেদকরের নির্বাচন তারই প্রমাণ। আম্বেদকরের উদ্যোগেই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নয়নের জন্য নীতি তৈরি করা হয়।

ভারতের সংবিধানে অবশ্য তফশিলি জাতি ও উপজাতির কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নেই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে তফশিলি জাতি ও

উপজাতির একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। ঐ তালিকা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্রপতির তরফে বিভিন্ন রাজ্যের তফশিলি জাতি ও উপজাতির একটি তালিকা তৈরি করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেই মর্মে একটি আইনও বলবৎ করা হয়েছে। সেই তালিকায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকেও রাখা হয়েছে। তাঁদের জন্য যথাযথ অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় শ্রেণিকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

কিন্তু 'অনগ্রসর' জাতি ও উপজাতি বলতে ঠিক কাদের বোঝায়, সে ব্যাপারেও সংবিধানে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। পরবর্তীকালে অনগ্রসরতার কয়েকটি মাপকাঠি সরকারের তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়। যেমন—

- হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী যাঁরা সমাজের নীচুস্তরে অবস্থান করেন;
- যাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন কম;
- যাঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সরকারি চাকরি পেয়েছেন এবং
- যাঁদের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও কম, তাঁরাই হলেন অনগ্রসর জাতি ও উপজাতি।

ভারতীয় সংবিধানে 'সংখ্যালঘু' বলতে সমাজে সংখ্যার ভিত্তিতেই সংখ্যালঘু বোঝানো হয়েছে। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুর ধারণা ব্যবহার হয়নি। সংবিধানগতভাবে সরকার সংখ্যালঘু মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষা করতে দায়বন্ধ। ভারতীয় সংবিধান দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

ভারতের সমস্ত মানুষকে তাঁর নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কিংবা সরকার কোনোভাবেই কোনো সংখ্যালঘু সংস্কৃতির উপর, সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি বা আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকার কোনো আইনও বলবৎ করতে পারে না। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধান ভাষার দিক থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের অধিকারও সুরক্ষিত করেছে। যেমন, সাঁওতাল জনগণের অলচিকি লিপিকে ভারতের সংবিধানে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরে তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে সংবিধান। সরকারি ও সরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক সুযোগ পাবেন। সরকারি অনুদান ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমস্ত রকম বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। তফশিলি জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন অনগ্রসর নাগরিকের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সমস্ত নাগরিককে

সমান মর্যাদা দেওয়া ভারতের সংবিধানের উদ্দেশ্য। সমস্ত নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংবিধান বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি জীবন-জীবিকা ও শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে ভারতের সংবিধান মানবিক দায়বদ্ধতার নজির রেখেছে।

সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ

ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের ছয়টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেই মৌলিক অধিকারগুলি হলো : **সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার**। এই অধিকারগুলি শাসন ও আইন বিভাগে কর্তৃত্বের বাইরে রয়েছে। তাই সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে ভারতের যে কোনো নাগরিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

অধিকার লাভের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক কর্তব্যসমূহ

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে —

- সংবিধান, সংবিধানের আদর্শ, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় স্তোত্রের প্রতি সম্মান দেখানো।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ আদর্শগুলির সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও রক্ষা করা।
- ভারতের প্রতিরক্ষায় অংশ নেওয়া এবং জাতীয় সেবামূলক কাজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাতে যোগ দেওয়া।
- ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত বিভিন্নতার উর্ধ্বে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং নারীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ত্যাগ করা।
- ভারতের সমন্বয়বাদী, মিশ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করা।
- ভারতের বন্যপ্রাণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করা।
- প্রত্যেক নাগরিকের তরফে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের মানসিকতাকে গ্রহণ করা ও তার দ্বারা চালিত হওয়া।

- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা ত্যাগ করা।
- ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বিক জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে চলা।
- বাবা-মা অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকার কর্তব্য হলো তাঁদের ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়স্ক সন্তান বা পোষ্যের শিক্ষার যথোচিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (এটি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনে যুক্ত হয়েছে)।

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও শিক্ষা। মূল ছবিটির শিরোনাম *বিশ্বশান্তি*, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :

ক) ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক

খ) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল

গ) পৌরসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা

ঘ) ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহরু, বি. আর. আম্বেদকর

ঙ) ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি, ২৬ নভেম্বর, ২০ মার্চ (স্বাধীন ভারতের নিরিখে)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) সংবিধান হলো বিচার বিভাগের আইন সংকলন।

খ) ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রূপকার বি. আর আম্বেদকর।

গ) ভারতে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক।

ঘ) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঙ) পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ টি শব্দ) :

ক) স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় ভারতের সংবিধান রচনার তাগিদ দেখা দিয়েছিল কেন?

খ) ভারতের সংবিধানে গণতান্ত্রিক শব্দটির তাৎপর্য কী?

গ) ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়েছে কেন?

ঘ) মহাত্মা গান্ধি দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

ঙ) ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের কী কী মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি ব্যাখ্যা করো। প্রস্তাবনায় বর্ণিত সাধারণতন্ত্র শব্দটি কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

খ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম বিষয়ে আলোচনা করো। যথাক্রমে রাষ্ট্র ও রাজ্যের পরিচালনায় এঁদের ভূমিকা কী?

গ) পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাধমে কীভাবে গণতন্ত্রের ধারণা বিস্তৃত হয়? তোমার স্থানীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা করো।

ঘ) ভারতের সংবিধান নারীদের অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত করেছে? নারীদের সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতোটা জরুরি বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দিয়ে লেখো।

ঙ) তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নয়নে সংবিধান কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) তোমার স্থানীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা তোমায় গ্রাম পঞ্চায়তে বা পৌরসভায় নির্বাচন করে পাঠালেন। তোমার এলাকার উন্নতির জন্য তুমি কী কী ব্যবস্থা নেবে?

খ) ধরো তুমি একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা। তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কী কী কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি তোমারা সবাই মিলে পালন করবে? কর্মসূচিগুলির একটি খসড়া তৈরি করো।

ভারত–ইতিহাসের সালতামামি
খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

১৭০৭ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।

১৭১৭ মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার ব্রিটিশ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকাব দেন।

১৭৪৪-'৪৮ প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ।

১৭৫০-'৫৪ দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ।

১৭৫৬-'৬৩ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ভারতে তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ

১৭৬০ বন্দিবাসের যুদ্ধ—ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান।

১৭৫৬ বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলা কর্তৃক ইংরেজদের কাছ থেকে কলকাতা অধিকার।

১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধ।

১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ।

১৭৬৫ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন।

১৭৬৭-'৬৯ প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৭২ গভর্নর হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নিয়োগ।

১৭৭৩ রেগুলেটিং অ্যাক্ট।

১৭৭৪ ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট (ইম্পিরিয়াল কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৭৫-'৮২ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৭৮০ হিকি-এর বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয়।

১৭৮০-'৮৪ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৮৪ পিট-এর ইন্ডিয়া অ্যাক্ট।

১৭৮৬ লর্ড কর্নওয়ালিস নতুন গভর্নর জেনারেল হন।

১৭৯০-'৯২ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৯৩ বাংলায় রাজস্ব আদায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন।

১৭৯৮ লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হন।

১৭৯৯ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৮০৩-'০৫ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৮১৭ কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮১৭-'১৯ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৮১৮ বাংলা ভাষায় সংবাদপত্ররূপে সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন প্রকাশিত হয়।

১৮২৮ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল হন।

১৮২৯ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

১৮৩৩ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিলোপ।

১৮৩৫ লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত দলিল।

১৮৪৫-'৪৬ প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ।

১৮৪৮ লর্ড ডালহৌসি গভর্নর জেনারেল হন।

১৮৫৩ বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু।

১৮৫৬ কোম্পানির তরফে অযোধ্যা অধিগ্রহণ। বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করা হয়।

১৮৫৭-'৫৮ সেনাবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহ।

১৮৫৮ ভারতে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের সূচনা।

১৮৫৯-'৬০ বাংলায় নীল বিদ্রোহ।

১৮৭৬ ভারতসভার প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬-'৭৭ দিল্লি দরবার — ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষিত।

১৮৭৮ 'রাজদ্রোহী' দেশীয় সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রণয়ন।

১৮৮৩ ইলবার্ট বিল বিতর্ক।

১৮৮৫ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৯ লর্ড কার্জন ভাইসরয় হন।

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন।

১৯০৬ সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা।

১৯০৭ জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন ও নরমপন্থী-চরমপন্থী বিচ্ছেদ।

১৯০৯ মর্লে-মিন্টো সংস্কারবিধি।

১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ।

১৯১২ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু।

১৯১৫ গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন।

১৯১৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লখনৌ চুক্তি। হোমরুল লিগ গঠন।

১৯১৯ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিধি। গান্ধির নেতৃত্বে রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

১৯২১ গান্ধির নেতৃত্বে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২২ চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।

১৯২৩ স্বরাজ্য দলের প্রার্থীদের আইনসভায় প্রবেশ।

১৯২৮ সাইমন কমিশনের ভারত সফর। কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভ। সর্বদলীয় সম্মেলন। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের বিষয়ে মোতিলাল নেহরুর প্রতিবেদন।

১৯২৯ লাহোর কংগ্রেস ও পূর্ণ স্বরাজের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তাব।

১৯৩০ গান্ধির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন। লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনা।

১৯৩১ গান্ধি-আরউইন চুক্তি। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধির অংশগ্রহণ এবং বৈঠক ব্যর্থ। ভগৎ সিং, সুখদেও ও রাজগুরুর ফাঁসি।

১৯৩২ কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং পুনা চুক্তি। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ।

১৯৩৪ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি।

১৯৩৫ ভারত শাসন আইন।

১৯৩৭ আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশন।

১৯৪০ লর্ড লিনলিথগোর ডোমিনিয়ন স্টেটাস বিষয়ক আগস্ট প্রস্তাব। মুসলিম লিগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৪২ ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা। ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

১৯৪৪ গান্ধি-জিন্নাহ্ আলাপ-আলোচনা।

১৯৪৫ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের বিচার — সর্বত্র প্রতিবাদ।

১৯৪৬ রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ। ভারতে মন্ত্রী মিশন। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার।

১৯৪৭ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ক্লিমেন্ট এটলির ঘোষণা। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। পাকিস্তান ও ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং গণ অভিপ্রয়াণ।

১৯৪৯ স্বাধীন ভারতের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত ও স্বাক্ষরিত (২৬ নভেম্বর)।

১৯৫০ নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠে ভারত (২৬ জানুয়ারি)।

[এই সালতামামি সম্পূর্ণ নয়। কেবল এই বইতে আলোচ্য প্রসঙ্গসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সালতারিখ এখানে দেওয়া হলো।]

****

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির জন্য অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বই *অতীত ও ঐতিহ্য* ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো। এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক যুগের ইতিহাসের (অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে আনুমানিক বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৫(সূর্যাস্ত আইন), ৫৮, ৬৩, ৮১, ৮২, ৮৬, ৯১, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৮, ১৩২, ১৩৭, ১৪২ ও ১৪৮ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি পর্যায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা, মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা করা যেতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও অভিনব তথা সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে **নিজে করো** শীর্ষক এবং অধ্যায়ের শেষে **ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**-র অন্তর্গত **কল্পনা করে লেখো** শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী **'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'** দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না**। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।